নভেম্বর ২০২২ ■ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৯

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

হেমন্ত

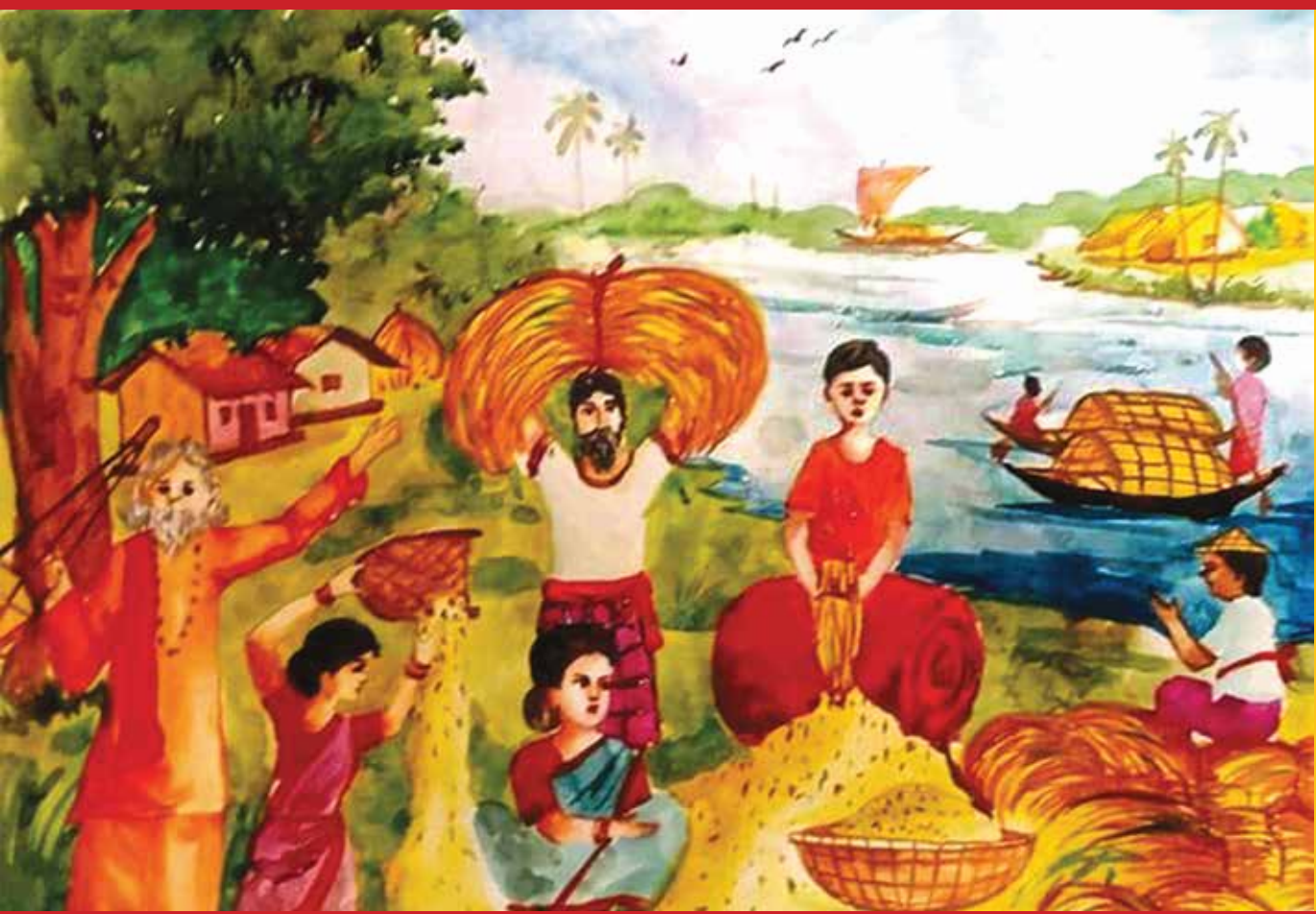

মাওজুদা বিনতে সালাম
৭ম শ্রেণি
তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ঢাকা

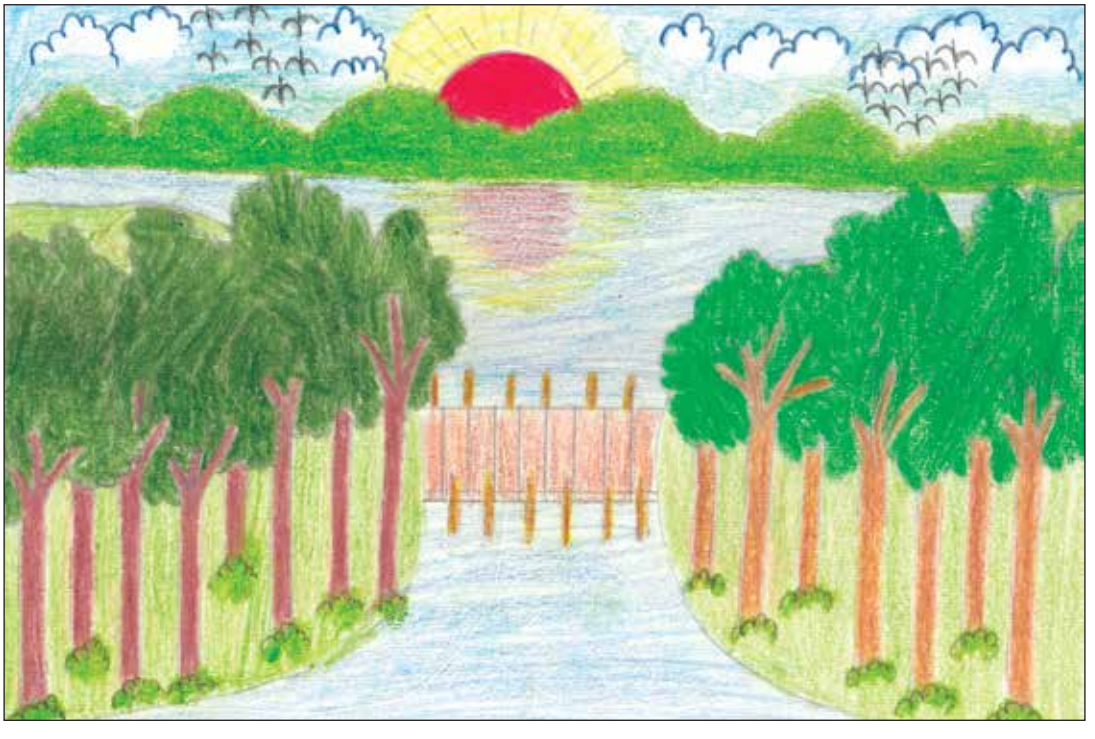

মৌমিতা আক্তার বন্যা, পঞ্চম শ্রেণি, নতুন কুঁড়ি কিন্ডার গার্টেন, শেরপুর

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, আমাদের জাতীয় জীবনে ৩রা নভেম্বর আরেক কলঙ্কজনক অধ্যায়। শোকাবহ জেল হত্যা দিবস। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বেদনাবিধুর ও কলঙ্কময় দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর দ্বিতীয় কলঙ্কজনক অধ্যায় জেল হত্যা। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায় ১৯৭৫ সালে। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। এই বীর চার নেতা হলেন –বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রীসভার সদস্য ক্যাপটেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় শুধু বাংলাদেশের মানুষই নয়, স্তম্ভিত হয়েছিল সমগ্র বিশ্ব। কারাগারের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা অবস্থায় বর্বরোচিত এ ধরনের হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই জানো হেমন্ত আসে নতুন বারতা নিয়ে। ছয়ঋতুর বাংলাদেশে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস নিয়ে হেমন্তকাল। এ সময়ে কৃষকের ঘরে ঘরে নতুন ধান ওঠে, ধানের সুগন্ধ আর আমেজে ঘরে ঘরে আনন্দের হিল্লোল বয়। চলে নবান্ন উৎসব। নতুন ধানের চাল থেকে তৈরি করা হয় মজার মজার পিঠা, পায়েস আর নানা রকম খাবার।

৯ই নভেম্বর রোকেয়া দিবস। তিনি (১৮৮০-১৯৩২) পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, যখন মুসলিম নারীসমাজ একেবারে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এই সময় তিনি মূলত লেখালেখির মাধ্যমে মুসলিম নারীদের আলোকিত পথে আহ্বান জানান। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো: মতিচূর, অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ ইত্যাদি।

বন্ধুরা, এবারের সংখ্যাটি আমরা সাজিয়েছি হেমন্তকাল নিয়ে গল্প, কবিতা, ছড়া ও আঁকা ছবি দিয়ে। তোমরা ভালো করে পড়বে কিন্তু। আর ঋতু পরিবর্তনের এই সময়টায় দেশে ডেঙ্গু, চোখ ওঠা, কোভিডের প্রকোপ বেড়েছে। তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে। ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের জন্য শুভকামনা।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

সূচিপত্র

নিবন্ধ

রূপবৈচিত্র্যের হেমন্ত/শামস্ নূর ০৪
মাছ ধরা উৎসব/শাহানা আফরোজ ১৪
হেমন্তের ফুল/রোমানুর রোমান ১৫
হেমন্তের ফল/শাখাওয়াত হোসেন ১৭
হিম-কুয়াশার হেমন্ত/কামরুল আলম ১৯
সাদা মেঘের ভেলা/আজহার মাহমুদ ২২
বিচিত্র রঙে শস্যোৎসব/সেলিনা আক্তার ২৫
বাংলার নবান্ন/মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন ২৯
শিখতে শিখি সহজে/কাজী নুসরাত সুলতানা ৪১
ডেঙ্গু প্রতিরোধে চাই সচেতনতা/হাছিনা আক্তার ৪৪
নারীমুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া/নুসরাত জাহান ৪৬
অলৌকিক কৈলাস পর্বত/শাহনেওয়াজ কবীর ৪৯
বিশ্বের বিস্ময় বুর্জ খলিফা/মো. জাবের আব্দুল্লাহ ৫৪

গল্প

তুনু ও হেমন্তের হলদে পাখিটা/কাজী কেয়া ০৯
হেমন্তের চিঠি/মোস্তাফিজুল হক ২৬
পৃথার পাঠ/প্রণব মজুমদার ৩১

সাফল্য প্রতিবেদন

ছয়বার ওয়ার্ল্ড গিনেস রেকর্ড/মেজবাউল হক ৫৭
ঝড়ের নামকরণ/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ৫৮
শিশু থাকুক যত্নে/মো. জামাল উদ্দিন ৫৯
জুনিয়র নোবেল জিতলেন জারিন/জান্নাতে রোজী ৬০
দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফফাত আঁখি ৬১

কবিতা ও ছড়া

০৩ জাহাঙ্গীর আলম জাহান
০৮ সুফিয়া কামাল
১২ আহসানুল হক/সনজিত দে/শাহ্জাহান সিরাজ
১৩ ফারুক হাসান/ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান/বারী সুমন
২১ মুহিবুল হাসান/মো. রিজন মিয়া
২৩ নূরে আলম সিদ্দিকী শান্ত/জহির টিয়া/সরোয়ার রানা
২৪ বিজন বেপারী/হুমায়ুন আবিদ
৪০ শাহ্ আবুল খায়ের
৫৫ রওশন আরা ভূঁইয়া

ছোটোদের ছড়া/লেখা

২৪ শেখ তাওসীফ বিন হাবিব
৩৩ তাসনুভা ফারিয়া, মাহমুদ হাসান, রূপা আক্তার
৪৮ নাফিজ আহমেদ, ইমরান খান রাজ
আবির হোসেন, নুসরাত জাহান নূর
৫২ মো. জোবাইদুল ইসলাম
৫৩ লাবিবা তাবাস্সুম রাইসা
৫৬ তালুকদার ফারহান আল আবরার

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

৩৪ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ

ছোটোদের আঁকা

প্রচ্ছদের ছবি : তিয়াশা সরকার
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : মাওজুদা বিনতে সালাম/মৌমিতা আক্তার বন্যা
৩০ আমিরা তাবাসসুম
৩৯ আনিশা চৌধুরী
৪৩ সুমাইয়া কামাল
৪৭ তাসনিম জাহান রাদিয়া
৬৩ ইনায়া/মো. আবু সাঈদ
৬৪ রুমাইজা শায়ওয়াত/রুকাইয়া মারজুকা

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

জেল হত্যার দিন

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

নভেম্বরের তিন
খুব কষ্টের দিন
নজরুল ইসলাম
কামারুজ্জামান
এবং তাজউদ্দিন
মনসুর আলীও
প্রাণ হারালেন।
নভেম্বরের তিন
খুব কষ্টের দিন!

পঁচাত্তরে নভেম্বরের
তিন তারিখের রাত
হঠাৎ বজ্রাঘাত
কারাগারে বয়ে গেল
রক্তেরই প্রপাত।

চার নেতাকে বন্দি করে
কারাগারের ভিতর
অস্ত্র নিয়ে ঢুকল রাতে
খুন পিয়াসি ইতর।

চারজনই তো বঙ্গবন্ধুর
কাছের নেতা ছিলেন
ইতিহাসের অংশী তারা
হননি লোভে ভিলেন।

রাত সুনসান নীরব নিথর
এমন সময় পাষাণ ইতর
ছুড়ল গুলি যেই
চার নেতা আর নেই।

নভেম্বরের দিনটি এলেই
জল ঝরিয়ে কাঁদি
শ্রদ্ধা নিয়ে বুক-জমিয়ে
পাথর শুধু বাঁধি।

জেল হত্যার দিন
ব্যথা যে চিনচিন
ভুলিনি সে বর্বরতার
গল্প কোনোদিন।

রূপবৈচিত্র্যের হেমন্ত

শামস্ নূর

ষড়ঋতুর অপূর্ব সমাহারের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এখানে প্রকৃতি রং বদলায় তার নিজস্ব নিয়মে। প্রকৃতির পরতে পরতে কত যে বিচিত্র রূপ, রস, গন্ধ ও বর্ণ মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, একটু খেয়াল করলেই তার খোঁজ পাওয়া যায়। চোখ মেলে দেখলে, কান পেতে শুনলে, মন ভরে অনুভব করলে আর হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলে যেন প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। সে কারণেই বার বার প্রকৃতি বিশ্ব চরাচরে এক অপার রহস্যের নাম। বিশেষ করে বাংলা ঋতুর বহু বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ মানুষকে মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে। এক অভাবনীয় রূপবিভায় বাংলার ঋতু-প্রকৃতি প্রতিটি বাঙালিকে ভাবালুতায় নিমজ্জিত করে। আবহমানকাল থেকে চলে আসছে এ প্রক্রিয়া।

শরতের শুভ্রতা শেষে হেমন্ত বাংলার জীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে। হেমন্ত হলো ষড়ঋতুর মধ্যে চতুর্থ মাস। কার্তিক-অগ্রহায়ণ দুই মাস হেমন্তকাল। এই দুই মাসের স্থায়িত্বকালে এর প্রভাব কিন্তু অসীম। এরপর আসে শীতকাল। আর তাই হেমন্তকে বলা হয় শীতকালের পূর্বাভাস। 'কৃত্তিকা' ও 'আর্দ্রা' এ দুটি তারার নাম অনুসারে নাম রাখা হয়েছে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের। 'মরা' কার্তিকের পর আসে সর্বজনীন লৌকিক উৎসব নবান্ন। 'অগ্র' ও 'হায়ণ' এ দু'অংশের অর্থ যথাক্রমে 'ধান' ও 'কাটার মৌসুম'। হেমন্তের স্নিগ্ধ, মায়াময় প্রকৃতির মধ্যে মানুষ যেন তার জীবনকেই খুঁজে ফেরে। হেমন্ত বাংলার মানুষের মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে ভাব, প্রকৃতিপ্রেম, বাঙালিয়ানা আর নিরন্তর সৃজনশীল কর্মকাণ্ড। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবর অগ্রহায়ণ মাসকেই বছরের প্রথম

মাস বা খাজনা তোলার মাস ঘোষণা করেছিলেন।

এক সময় বাংলায় বছর শুরু হতো হেমন্ত দিয়ে। কারণ, ধান উৎপাদনের ঋতু হলো এই হেমন্ত। বর্ষার শেষ দিকে বোনা আউশ-আমন শরতে বেড়ে ওঠে। আর হেমন্তের প্রথম মাস কার্তিকে ধান পাকে। এ ঋতুতে ফোটে গন্ধরাজ, মল্লিকা, শিউলি, কামিনী, হিমঝুরি, দেব কাঞ্চন, রাজ অশোক, ছাতিম, বকফুলসহ বিভিন্ন ফুল।

ইউরোপে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে হেমন্তের শুরু। সেখানে একে বলা হয় বৈচিত্র্যময় রং ও পাতা ঝরার ঋতু। ঝাউ গাছগুলো ছাড়া সব গাছেরই পাতা এ সময় ঝরে যেতে শুরু করে এবং শীতের আগমনের আগেই সব বৃক্ষ ন্যাড়া হয়ে যায়।

হেমন্ত ঋতুতে প্রকৃতি ও মানুষের রূপবদল বড়ো অপূর্ব। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ জুড়ে কেবল সোনালি রঙের ধান আর ধান। দলে দলে মানুষজন সেসব ধান কাটে, আঁটি বাঁধে আর সেসব ধানের আঁটি বাগের দু'পাশে দাঁড়িপাল্লার মতো ঝুলিয়ে বাগ কাঁধে বাড়ি ফেরে। এক সময় সেসব ধানের আঁটি বোঝাই গরুর গাড়ি মেঠো পথে 'ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্' শব্দ করে গৃহস্থের বাড়ি বা ধানখোলার পথে চলত। এখন পাওয়ার টিলার কিংবা যান্ত্রিক বাহন সে স্থান দখল করে নিয়েছে।

হেমন্তের ফসল কাটাকে কেন্দ্র করেই নবান্ন উৎসবের সূচনা হয়। নবান্ন যার অর্থ দাঁড়ায়– নতুন অন্ন, সন্ধি বিচ্ছেদ হলো– নব+অন্ন = নবান্ন। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব। নবান্ন হলো নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসব, যা সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান পাকার পর এই অনুষ্ঠিত হয়।

হেমন্তে ভোর থেকে কুয়াশা নামে চাষের ক্ষেতে। বিন্দু বিন্দু শিশির জমে আছে ধান গাছের বুড়ো পাতায়। এ সময় খেতের ওপর ওড়াওড়ি করে ফড়িঙেয়ের দল। সোনালি ধানের ক্ষেত ডিঙিয়ে পূর্ব দিগন্ত রাঙিয়ে উঠছে ভোরের সূর্য। হালকা শীত শীত ভোরের ভেতর মিষ্টি রোদ–আহ্, কি যে ভালো লাগা, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না!

হেমন্তের শেষের দিকে গ্রামে আরেকটি দৃশ্য চোখে পড়ে। গাছিরা কুয়াশা ভেঙে ধীরলয়ে হাঁটে, তরতর করে খেজুর গাছে ওঠে। ধারালো দা দিয়ে খেজুর গাছের মাথা চেঁছে করে রস নামানোর আয়োজন। হেমন্তের মাঝখান থেকেই শুরু হয় সেসব রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানানোর মহোৎসব। গাঁয়ের অনেক গৃহস্থ বাড়ির উঠোনে বড়ো উনুন তৈরি করা হয়, তার ওপর পাত্র রেখে খেজুরের রস জ্বাল দেওয়া হয়। রস জ্বালের ঘ্রাণে তখন গ্রামগুলো যেন মৌ মৌ করে ওঠে।

হেমন্ত যেন 'মাছ-ভাতে বাঙালি' হওয়ার ঋতু। দেশের অনেক বিল-ঝিল-হাওর-বাঁওড় এ সময়টায় শুকাতে শুরু করে। আর সেসব শুকাতে থাকা জলাশয়ে ধরা পড়তে থাকে মাছ। হেমন্তকালে বড়োদের সাথে গ্রামের শিশু-কিশোরেরাও মাছ ধরতে নেমে পড়ে বিলে-ডোবায়। নানারকম দেশি মাছে বাজার ভরে ওঠে। আইড়, বোয়াল, চিতল, পুঁটি, ট্যাংরা, কৈ, মাগুর, শোলসহ কত রকমের মাছ যে ধরা পড়ে। হাওর-বাঁওড়-বিলে তাই হেমন্তে রচিত হয় দলে দলে ধান কাটার পাশাপাশি মাছ ধরাও। মাছ ধরা শেষে টুকরি ভর্তি মাছ নিয়ে জয়ীরবেশে ঘরে ফেরে মানুষ। কিষানির রান্নাঘর থেকে মাছ ভাজার মৌ মৌ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। গ্রামের ঘরে ঘরে এই আনন্দ প্রবহমান থাকে। এছাড়া হেমন্তে নানা ধরনের উৎসব-পার্বণে গ্রাম-বাংলার জীবন মুখরিত থাকে।

হেমন্তে অনেক শীতের সবজিও উঠতে শুরু করে। আগাম বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালংশাক, শিম, মূলা– কী নেই হেমন্তের বাজারে? একদিকে কৃষক ধান কেটে গোলায় তোলে, অন্যদিকে চৈতালি বা রবি ফসল বোনার কাজ শুরু করে। লাখ লাখ কৃষান-কৃষানির জীবনে যেন নেমে আসে এক অনাবিল পার্বণের আনন্দ, নতুন ধানে শুরু হয় নবান্ন উৎসব। এক কথায়, মহাব্যস্ততায় কাটে হেমন্তে কৃষক ভাইদের দিনগুলো।

একে একে হেমন্ত আসে, হেমন্ত চলেও যায়। হেমন্ত মানেই আমরা এখন অনেকেই ভাবি নবান্নের ঋতু, কিন্তু হেমন্ত যে এক বহুরূপী প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ এক ঋতু সে কথাটা যেন ভুলে যাই। কিছুটা ঠান্ডা, কিছুটা গরম, অনেকাংশেই নাতিশীতোষ্ণ– এরকম এক আবহাওয়ার ঋতু হলো হেমন্ত। কখনো ঝড়-মেঘ, কখনো কুয়াশা। সবুজ ধানক্ষেতগুলো ধীরে ধীরে সোনা রঙে বদলে যায়। অতিথি পাখিদের আগমন। গাঁয়ে গাঁয়ে খেজুর গুড় আর পিঠের ঘ্রাণ। ঝকমকে তাজা মাছে সাজানো জেলেদের ডালা। এই তো আমাদের অনেক রূপের হেমন্তের প্রকৃতি আর সে প্রকৃতির আশ্রয়ে আমরা একটু অন্যরকম হই। কিন্তু ভয় হয়, যেভাবে পৃথিবীর জলবায়ু বদলাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে দূষণ, বাড়ছে যান্ত্রিকতা–তাতে আগামীতে আমরা আমাদের এমন চেনা হেমন্তকে খুঁজে পাবো তো!

শিশিরভেজা দূর্বা ঘাস মাড়িয়ে প্রকৃতির মধ্যে হেমন্তের প্রবেশ সৃজনশীল মানুষের মন ও হৃদয়কে নানাভাবে চাঙা করে, উজ্জীবিত করে। সহজিয়া মনের অলিন্দে অলিন্দে খেলা করে নিত্যনতুন সৃষ্টি। গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, নাটক, যাত্রাপালা, বৈঠকি গান, পুতুল নাচ, জারি-সারি, বাউল গান, কবির লড়াই- সবকিছুতেই হেমন্ত এনে দেয় নতুন এক মাত্রা। হেমন্ত ঋতুর শান্ত প্রকৃতি অনেক কবি সাহিত্যিক নানাভাবে তাদের রচনায় তুলে ধরেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, সুফিয়া কামাল, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ।

কাজী নজরুল ইসলামের 'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতায় নবান্নের চিত্রটি বেশ উপভোগ্য। 'অঘ্রাণের সওগাত' নজরুল লেখেন ১০ই কার্তিক ১৩৩৩ সনে। একটি বাঙালি পরিবারের নবান্ন উৎসব এবং নবান্ন সময়ের পরিবেশ বলে দেয় নবান্ন উৎসব কখনোই বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের নয়। এটা মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও পালন করে থাকে। 'অঘ্রাণের সওগাত' ৬ লাইন করে ৬টি স্তবক অর্থাৎ ৩৬ লাইনের কবিতা। প্রথম স্তবকটি এ রকম-

ঋতুর খাঞ্জা ভরিয়া এলো কি ধরনীর সওগাত?
নবীন ধানের অঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হলো মাৎ।

'বিন্নি পলাশ' চালের ফিরনি
তশতরি ভরে নবীনা গিন্নি
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশিতে কাঁপিছে হাত।
শিরনি রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ি গন্ধে তেলেসমাত।

এছাড়াও এই ঋতুকে নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিমের রাতে ওই গানটিতে লিখেছেন:

হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে,
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো 'দীপালিকায় জ্বালাও আলো, জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।'

বিশ্বকবি তাঁর নৈবদ্যে স্তব্ধতা কবিতায় লিখেছেন:

'আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে
জনশূন্য ক্ষেত্র মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্ত প্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি।'

হেমন্তের অপার সৌন্দর্য মানুষের মনকে নানা রঙে রাঙিয়ে তোলে। এই সৌন্দর্য প্রেমিক হৃদয়কে মাতোয়ারা করে দিয়ে তার মনোলোকে তৈরি করে আশ্চর্য এক জগৎ যেখানে জীবন ও মানুষই হয়ে ওঠে মূল শক্তি। কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আবার আসিব ফিরে'–তে অসাধারণভাবে হেমন্তের ছবি এঁকেছেন, তীব্র ভালোবাসায় উচ্চারণ করেন–

'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে– এই বাংলায়/হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে/হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে/কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব কাঁঠাল ছায়ায়'। ■

প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক

হেমন্ত

সুফিয়া কামাল

সবুজ পাতার খামের ভেতর
হলুদ গাঁদা চিঠি লেখে
কোন্ পাথারের ওপার থেকে
আনল ডেকে হেমন্তকে?

আনল ডেকে মটরশুঁটি,
খেসারি আর কলাই ফুলে

আনল ডেকে কুয়াশাকে
সাঁঝ সকালে নদীর কূলে।

সকাল বেলায় শিশির ভেজা
ঘাসের ওপর চলতে গিয়ে
হাল্কা মধুর শীতের ছোঁয়ায়
শরীর ওঠে শিরশিরিয়ে।

আরও এল সাথে সাথে
নুতন গাছের খেজুর রসে
লোভ দেখিয়ে মিষ্টি পিঠা
মিষ্টি রোদে খেতে বসে।

হেমন্ত তার শিশির ভেজা
আঁচল তলে শিউলি বোঁটায়
চুপে চুপে রং মাখাল
আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায়।

গল্প

তুনু ও হেমন্তের হলদে পাখিটা

কাজী কেয়া

তুনুর মন ভালো নেই। ভালো থাকার কথাও নয়। নানু চলে গেল কদিন আগে। প্রতি বছর নানু ওদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। সঙ্গে আসে ছোটোখালা আর বিলুমামা। আসে অনেক অনেক মজার খাবার আর তুনুর জন্য খেলনা নিয়ে। এবারও চাবিঅলা পুতুল আর ঝুমঝুমি এনেছিল। চাবিঅলা পুতুল কথা বলে, নাচে চাবি ঘুরিয়ে দিলেই। আর নানু বাড়ির গাছের পাকা আতা, পেয়ারা, নারকেল– এগুলো তো আনেই প্রতিবার। তুনুরা থাকে শহরতলিতে। শহর আর গ্রামের মিশেল জায়গাটা। নাম তারাগঞ্জ। তবে গ্রামের আবহই বেশি। পাশে ছোট্ট একটা নদী। নদীর নাম অনামিকা। হুম, নানু বাড়ি দেবহাটা। কী সুন্দর নানু বাড়ির গ্রামটা। গাছ আর গাছ। কত পাখি। দিনভর পাখির ডাকে মন নেচে ওঠে। তবে তুনু একবারই গিয়েছিল নানু বাড়ি। তখন ওর বয়স মাত্র সাড়ে তিন বছর। এত ছোটো ছিল, তবুও ওর মনে আছে সব।

নানুর লাল মোরগটার কথাও ওর মনে আছে। উঠোনের পুবপাশে বিরাট ধানের গোলা। সেই গোলার চুড়োয় বসে লাল মোরগটা খুব ভোরে গলা চড়িয়ে ডাক দিত- কুক্কুর কু...। নানু বাড়ির মোরগের গল্পটা তুনু প্রায় তার আম্মুকে শোনায়। আম্মু তো অবাক! বলেন, তুমি তো তখন খুব ছোটো। বিলু মামার ঘাড়ে চড়ে ঘুরতে। কথাও ফোটেনি তেমন। তো, সে-কথা মনে রাখলে কী করে? তুনু হাসে, আম্মু আমার সব কথা মনে থাকে।

নানু বাড়ির পাশ দিয়েও একটা নদী বয়ে গেছে। নদীটার নাম কী যেন! মনে নেই তুনুর। তবে তুনুদের অনামিকা নদীটাই নানু বাড়ির নদীর সঙ্গে মিশেছে গিয়ে। আর এজন্যই নানুদের নৌকা এসে তুনুদের নদীর ঘাটে এসে ভেড়ে। এবারও এই নদীপথেই নানুরা আসে। তো নানু আসার আগে তুনু অপেক্ষায় থাকে। দিন গোনে– এক-দুই-তিন...। আর অপেক্ষা করে একটা পাখির ডাক শোনার জন্য। সারা-গা হলদে। লেজে আর মাথায় একটু কালো ছোপ। এই পাখিটা ডাকলেই নাকি কুটুম আসে। ও ডাকেও কুটুম কুটুম করে। সেজন্য ওর নাম কুটুম পাখি। তুনু ওকে বলে হলদে পাখি। তো, তুনুদের উঠোনের চালতা গাছের আবডালে বসে পাখিটা কখন এসে ডাকবে সেই অপেক্ষায় থাকে তুনু। সত্যিই পাখিটা ডাকলে কুটুম আসে, যেদিন নানু এল পাখিটা খুব ডেকেছিল। মা বলল, ঠিক কেউ আসবে। মায়ের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই বিলুমামা হই-হই করে ঢুকল তুনুদের বাসায়। সঙ্গে নানু আর ছোটোখালা।

তো নানু এবার মাত্র পাঁচ দিন ছিল। পাঁচ দিন কি কোনো দিন হলো। কী করে যেন ফুরিয়ে যায়। ওহো, নানু অনেক গল্প জানে। রাতে নানুর পাশে শুয়ে শুয়ে তুনু গল্প শোনে। কী যে মজার গল্প সব। সেই তেপান্তরের মাঠে রাজার ছেলে ডালিম কুমার পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চড়ে ছুটে যায়। তারপর সুয়োরানি-দুয়োরানির গল্প। নানু বলেছিল তোমাকে আধহাত মানুষ আর তেরো হাত দাড়ির গল্প শোনাবো। তা আর হলো কই? নানু চলে গেল। মন খারাপ তুনুর। কিচ্ছু ভালো লাগে না। মা বলেন, তুনুমনি মন খারাপ করো না। আবার নানু আসবে। তুনু বলে, কবে আসবে, কখন আসবে। গেল কেন?

মা হাসেন। তুনুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, আসবে, আবার যখন তোমার হলদে পাখিটা কুটুম কুটুম বলে ডাকবে। কখন ডাকবে পাখিটা? কত দিন হয়ে গেল নানু গেছে।

এই তো, সামনের হেমন্তে। যখন সোনার ফসলে ভরে যাবে মাঠ। নতুন চালের গন্ধ ভাসবে বাতাসে। তখনই তো নানু আসে। দেখবে হেমন্ত দেখতে দেখতে চলে আসবে।

দুই

তুনু আরো বড়ো হয়েছে। এখন সে ক্লাস টু তে পড়ে। বইয়ের সব ছড়া ওর মুখস্থ। এবার নানু এলে সে সব ছড়া তাকে শোনাবে। অপেক্ষায় থাকে তুনু। হেমন্তের অপেক্ষায় থাকে। হলদে পাখির অপেক্ষায় থাকে। পাখিটা ডাকলেই নানু আসবে।

আর দেরি নেই। শরতের দিন প্রায় শেষ। উঠোনোর শিউলি গাছটায় এখনো ফুল ফোটে। তবে আগের মতো না। অনামিকা নদীর দুপাড়ের কাশবনে এখনো বাতাসের ঢেউ ওঠে। তবে, সাদা কাশের রং কেমন সোনালি মতো হয়ে উঠেছে। হেমন্তে কাশফুলও রং বদলায়। তুনু এরমধ্যেই ওর ক্লাসের বন্ধুদের খবরটা জানিয়ে দিয়েছে, তার নানু আসবে হেমন্ত এলেই। হলদে পাখিটা ডাকলেই। আরো বলেছে, নানু অনেক মজার মজার খাবার আনে। তিলের খাজা, নারকেলের নাড়ু, মোয়া আরো অনেককিছু। সে সবাইকে নানুর আনা নাড়ু-মোয়া খাওয়াবে। তুনুর কথায় ওর বন্ধুরাও এখন রোজ রোজ জানতে চায়, তুনু তোমার নানু কবে আসবে। কবে তুমি আমাদের জন্য নাড়ু-মোয়া আনবে? তুনু হেসে বলে, এই তো হেমন্ত এলেই। তুনুও বাসায় এসে মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করে, মা হেমন্ত কবে আসবে। মা বলেন, এই তো এসে গেল আর কী!

ইশকুল থেকে ফিরে বিকালবেলা হলেই তুনু উঠোনের চালতা গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে খোঁজে হলদে পাখিটাকে। কখন সে এসেই না জানি

কুটুম কুটুম বলে ডেকে ওঠে। ওহ, পাখিটা দেখতেও যেমন, ওর গলার সুরও তেমন। ওর কুটুম কুটুম ডাকটা কী মধুর লাগে শুনতে। তুনুর চোখ সরে না গাছটা থেকে।

ওহো, বলাই হলো না তুনুর বাপির কথা। বাবাকে তুনু বাপি বলে। তার বাপি কলেজের শিক্ষক। সবাই বলে অধ্যাপক সাহেব। অধ্যাপক হাসিনুল হক। তিনি কবিতাও লেখেন। তাই কেউ বলে, কবি সাহেব। তুনুকে বাপি নিজের লেখা কবিতা শোনান। ছড়া শোনান। তুনু বাপির অনেক ছড়া শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলেছে। বাপির কবিতা আবৃত্তি করে ইশকুলের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে সে প্রথম হয়ে একটা বই পুরস্কার পেয়েছে। বইটার নাম– বাংলা মায়ের সাতটি ছেলে। এই বইটাও তার পড়া শেষ। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাত শহিদ বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনী লেখা বইটায়।

তুনু অনেক কিছু শিখেছে বই পড়ে পড়ে। বাপি তাকে অনেক বই কিনে এনে দেন। বাপি বলেন, তুনুমনি, মনে রাখবে বই হলো আলোর পাঠ। যত পড়বে তত জানবে। মন আলোয় ভরে ওঠে বই পড়লে। বাপির কথায় তুনু বলে, বাপি আমি একটা ছড়া বলি? এই বলে সে বলে, ভালো বই আলোঘর। বাপি অবাক হন তুনুর ছড়া শুনে। এটা কি তুমি বানিয়েছ তুনু? বাপির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলে, হুম, বাপি, হঠাৎ মনে চলে এল, তাই শোনালাম। বাপি তুনুর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দেন।

দিনটি মঙ্গলবার। খুব ভোরে ঘুম ভাঙে আজ তুনুর। ঘুম ভাঙতেই শোনে সেই পাখির ডাকটা। বিছানা ছেড়ে চোখ ডলতে ডলতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুবের চালতা গাছের দিকে তাকায়। না, পাখিটাকে দেখতে পায় না। ডাকটা কিন্তু তখনও শুনতে পায়। দূরে কোথাও ডাকছে পাখিটা। মা রান্নাঘরে নাশতা বানাচ্ছেন। তুনু মা-মা বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে যায়। মা, হলদে পাখিটা ডাকছে। কিন্তু আমাদের চালতা গাছে তো না, কোথায় ডাকছে মা? হেমন্ত কী এসে গেল মা! মা বললেন, হুম, তাই তো, আজ কার্তিকের দুই হয়ে গেল। মানে গতকালই হেমন্ত এসে গেছে। খুশিতে তুনু হাততালি দিয়ে লাফাতে থাকে। তাহলে নানু আসবে, নানু আসবে ঠিকই। মা বললেন, হয়ত আসবে।

হলদে পাখির ডাক আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কান পেতে শোনে তুনু। একটু পর ছুটতে থাকে তুনু। তুনু ছুটছে অনামিকা নদীর দিকে। যেখানে নৌকাগুলো এসে থামে। তুনুদের ঘাট। দৌড়াতে দৌড়াতে ঘাটের পাশে দাঁড়ায় তুনু। দেখে দূরে অনেক পালতোলা

নানু আসার আগে তুনু অপেক্ষায় থাকে। দিন গোনে– এক-দুই-তিন...। আরো অপেক্ষা করে একটা পাখির ডাক শোনার জন্য। সারা-গা হলদে। লেজে আর মাথায় একটু কালো ছোপ। এই পাখিটা ডাকলেই নাকি কুটুম আসে। ও ডাকেও কুটুম কুটুম করে। সেজন্য ওর নাম কুটুম পাখি।

নৌকা। সাদা-লাল-নীল-সবুজ... কত রঙের বাদাম। বাতাসে বাদামগুলো ফুলে উঠছে। কোন নৌকাটায় নানু আসছে? মনে মনে ভাবে তুনু। মনে হচ্ছে ওই নৌকাটাতেই। লাল-সবুজ পতাকার মতো বাদাম তোলা নৌকাটা। মনে হচ্ছে এই ঘাটের দিকেই আসছে। তুনুর মনে আনন্দ উপচে ওঠে। নানু আসছে। হঠাৎ পাখিটা আবার ডেকে উঠল। কান পাতে তুনু। কুটুম-কুটুম-কুটুম... কী সুন্দর, মিষ্টি করে ডেকেই চলেছে তুনুর প্রিয় পাখিটা। তুনুর হলদে পাখিটা। হেমন্তের সোনালি পাখিটা। ■

শিশুসাহিত্যিক

হেমন্তের রূপ

আহসানুল হক

ঝিরিঝিরি ঝিরিঝিরি বয় সমীরণ
কার্তিকেরই ভোরে
শীতের আমেজ কড়া নাড়ে
প্রকৃতিরই দোরে!

সোনা ধানে দৃষ্টি জুড়ায়
পুলক জাগায় প্রাণে
হাওয়ায় হাওয়ায় মৌ-মধু ঘ্রাণ
নবান্ন-অঘ্রাণে!

মুড়কি-মুড়ি, পিঠা-পায়েস
বিন্নিধানের ভাতে
কৃষাণ বধূ ব্যস্ত শুধু
উৎসবেতে মাতে!

নীলাভ আকাশ কাত হয়ে যায়
কত্ত যে ফুল ফোটে
মাঝির কণ্ঠে গানের কলি
সুর যে পাখির ঠোঁটে!

হেমন্তের এই রূপ-অপরূপ
দাগ কেটে যায় মনে
দুষ্টু কিশোর কাটায় দুপুর
পাখপাখালির সনে!

বুক ভরা আশা

সনজিত দে

কৃষকেরা ধান গোলায় ভরেছে
মুখে ফোটে তাই হাসি
হাসিখুশি মনে সুখ ছেয়ে যায়
স্বপ্নেরা রাশি রাশি ।

বুক ভরা আশা মন ভরে যায়
মিষ্টি ধানের ঘ্রাণে
কষ্টের দিন শেষ হলো বলে
সাড়া জাগিয়েছে প্রাণে।

কৃষানির মুখে তৃপ্তির হাসি
নতুন শাড়ির ভাঁজে
এই নবান্ন উৎসবে তাই
মাতোয়ারা হয়ে সাজে।

চলো চলো চলো দলে দলে আজ
হেমন্তে মাঠে মাঠে
মেতে ওঠে প্রাণ গেয়ে উঠি গান
জারি সারি পুঁথি পাঠে।

হেমন্ত এল

শাহ্‌জাহান সিরাজ

কুয়াশা ভেজা মটরশুঁটি
হাঁটু জলে টেংরা পুঁটি।
শিশিরভেজা দূর্বাঘাস
শিউলি ফুলের মিষ্টি বাস।

আমন ধানের তাজা ঘ্রাণ
রোদের আজ নেই তো প্রাণ।
ঘরে ঘরে পিঠার ঘ্রাণ
কৃষানির মুখে সুখের গান।

প্রকৃতিতে আজ কী হলো?
বাংলায় ঋতু হেমন্ত এল।

মোহন মায়ায় মনটা টানে

ফারুক হাসান

অনেক পাখির ভিড়ে দোয়েল
কণ্ঠে তোলে শিস
মোহন মায়ায় মনটা হারায়
ছুটছি অহর্নিশ।
ধানী মাঠের ক্ষেত পেরোলেই
ওই যে দূরের বন
খালের জলে সূর্য জ্বলে
নেয় কেড়ে নেয় মন।

রাখাল ছেলে আনমনে তাই
বাঁশিতে সুর তুলে
আত্মভোলা হয় যে শুধু
কাজের কথা ভুলে।

শিয়াল মামার কান্না শুনি
রাতের আকাশ জুড়ে
বুঝি না ছাই বিলাপ
করছে করুণ সুরে।

নবান্নের উৎসব

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান

কিষান ঘরে খুশি এল হেমন্তকাল পেয়ে
ঘাসের ডগা সজীব হলো শিশিরকণায় নেয়ে।
সকালবেলায় ঘুঘু ডাকে সবুজ পাতার ফাঁকে
রাঙা ঠোঁটে ফুটল হাসি ধান-শালিকের ঝাঁকে।

মাঠে হাসে সোনালি ধান রোদের আলিঙ্গনে
শিমের মাচায় দোয়েল নাচে পুলক জাগে মনে।
মধুর বাসে মন কেড়ে নেয় মাঠের পাকা ধান
শীতের বুড়ি আসবে শুনায় ঝরাপাতার গান।

নাবে কখন খাবে কখন কিষানি যায় ভুলে
ধানের সাথে কথা বলে দীঘল খোলা চুলে।
কিষান থাকে মাঠে পড়ে সকাল-দুপুর-সাঁঝে
ধানের বাসে মনে তাদের সুখের বীণা বাজে।

হেমন্তকাল বাংলা মায়ের অনন্ত এক সুখ
নতুন ধানের মধুর বাসে ভরে মায়ের বুক।
পাখপাখালির রাঙা ঠোঁটে ফোটে কলরব
বাংলা জুড়ে মেতে ওঠে নবান্নের উৎসব।

হেমন্ত বরণ

বারী সুমন

হেমন্তে চারদিকে
সোনা ঝরা ধান
দেখলেই অজান্তে
নেচে উঠে প্রাণ।

কার্তিকের কুয়াশায়
সবকিছু আচ্ছন্ন
জানিয়ে যায় শরৎ
হেমন্ত আসন্ন।

সবুজের সমারোহে
সোনালি আবরণ
ঘরে ঘরে চলছে
হেমন্ত বরণ।

মাছ ধরা উৎসব

শাহানা আফরোজ

হেমন্ত এসে গেল। বদলে গেল আবহাওয়া। রাতের হাওয়ায় হিমেল পরশ। কুয়াশার ঘন ঘোরে সকাল-সন্ধ্যায় মুখ লুকোবে আকাশ। দিনগুলো ছোটো হয়ে আসবে। সূর্যের খরতাপও ম্লান হবে ক্রমেই। বর্ষায় টইটম্বুর হয়ে উঠেছিল যেসব খালবিল, জলাশয়; সেসবের পানি নামতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে গ্রামবাংলায় ফিরে এসেছে এক চিরচেনা আনন্দঘন দৃশ্য।

বর্ষার পানি সরে যাওয়ার শেষ সময়ে (আশ্বিন-কার্তিকে) পানি কমতে থাকা খাল-বিলে বালক-কিশোর থেকে শুরু করে সব বয়সের উৎসাহীদের দল মহোৎসাহে নেমে পড়ে। পলোফার জাল, ছিটকি জাল, ঝাঁকি জাল, পেলুন, ঠেলা জাল নিয়ে মাছ ধরায় নেমে পড়ে বিলে। সে এক মহা-আনন্দের আয়োজনই বটে। সাথে থাকে খলুই হাতে শিশুরাও। দিনে দিনে পানি যতই শুকায়, আনন্দযজ্ঞেও যোগ হয় নতুন মাত্রা। তখন ডোঙা, সেনি, বালতি প্রভৃতি দিয়ে পানি সেচে কাদা ঘেঁটে পুঁটি, টেংরা, দারকিনা, শোল, টাকি, মাগুর, শিং, কই ধরার যে বিমল আনন্দ বাঙালির জীবনে, এ দেশে যারা জন্মেনি তারা কি তা কোনোদিনই অনুভব করতে পারবে! কাদা-পানিতে সারা শরীর মাখামাখি করে তারা মাছ ধরার আনন্দে বিভোর থাকে। বর্ষাকালে ফিশারিসহ বিভিন্ন জলমহালের মাছ ভেসে গিয়ে ডোবা-পুকুর, খালবিল এবং নিচু জলাভূমিতে আশ্রয় নেয়। পরে পানি টান দিলে সেইসব মাছ ধরা পড়ে। মৎস্য শিকারীরা বাঁশের তৈরি বিশেষ ফাঁদ জমির রোপা ধানের ফাঁকে ফাঁকে এবং ছোটো ছোটো নালায় পেতে রাখে এবং পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পরপর ওই সব জায়গা থেকে ফাঁদ তুলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরে। বাঁশ দিয়ে তৈরি ওই ফাঁদে মাছ একবার ঢুকে পড়লে আর বের হতে পারে না।

বিল এলাকার প্রতিটি গ্রামেই পূর্ব থেকে মাছ ধরার ঘোষণা করা হয়। সবাই মেতে উঠে মাছ ধরার উৎসবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর নামও আলাদা যেমন- 'বাউতনামা', 'বাওয়াইত', 'হাইত','পলোবাওয়া', 'বাঁওড় দেওয়া' ইত্যাদি। পলো আর লাঠি নিয়ে মাছ ধরায় নেমে পরে ছেলে, বুড়ো, যুবক। অনেকে আবার পলোর সারির পেছনে পেছনে ঠেলা বা খেপলা জাল হাতে নেমে পড়ে। যার পলো-জাল কিছুই নেই সেও নেমে পড়ে খালি হাতে। পরনের লুঙ্গি আটঘাট করে 'কাছা' দিয়ে বিলের এক প্রান্ত থেকে সকলে একই সঙ্গে লাইন ধরে নান্দনিক ছন্দে ঝপঝপা ঝপ শব্দে পলো দিয়ে মাছ ধরা শুরু করে। সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। অনেকেরই মাথায় বাঁধা থাকে গামছা। পানিতে একের পর এক চাপ দেওয়া আর হই-হুল্লোড় করে সামনের দিকে অঘোষিত ছন্দের তালে তালে এগিয়ে যাওয়া। যেন এক নিজস্ব চিরচেনা গ্রামবাংলার অপরূপ সৌন্দর্যময় দৃশ্য। সে সময়ে দেখা হয় দশ গ্রামের মানুষের সঙ্গে। চলে একে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় আর হাসি-ঠাট্টা। দিন শেষে হরেক রকম মাছে ভরে উঠে খলুই। সারাদিনের কাদা-পানি মাখা মানুষটিকে চেনাই দায় হয়ে পড়ে। এভাবেই শেষ হয় হেমন্তের মাছ ধরা উৎসব। ■

হেমন্তের ফুল

রোমানুর রোমান

ধানের ঋতুই একমাত্র পরিচয় নয় তার। ফুলে ফুলেও হেমন্ত অন্য ঋতুর চেয়ে আরেক কাঠি শৈলীতে সাজে। তার রয়েছে আপন বৈশিষ্ট্য। ঋতুভিত্তিক বৈশিষ্ট্য, যা অন্যের থেকে অন্যরকম। যা হেমন্তকে চিহ্নিত করে নিজস্বতায়। শিউলি, কামিনী, গন্ধরাজ, মল্লিকা, ছাতিম, দেবকাঞ্চন, হিমঝুরি ও রাজঅশোকসহ আরও কত যে নাম না জানা সতেজ ফুলের গন্ধে ভরে হেমন্ত তা অনুচ্চারিত। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই শুদ্ধতার পরিবেশ। প্রকৃতির সতেজতায় মৃত্যুগন্ধা হাওয়ায় ভাসে। ফুলের দিকে তাকিয়েও বলে দেওয়া যায় এটা হেমন্তকাল। তাহলে জেনে নেওয়া যাক ফুলগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিচিতি-

শিউলি ফুল: বৈজ্ঞানিক নাম Nyctanthes arbor-tristis. শিউলি নিক্টান্থেস (Nyctanthes) প্রজাতির একটি ফুল। এটি দক্ষিণ এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব থাইল্যান্ড থেকে পশ্চিমে বাংলাদেশ, ভারত, উত্তরে নেপাল ও পূর্বে পাকিস্তান পর্যন্ত এলাকা জুড়ে দেখতে পাওয়া যায়। এটি শেফালি নামেও পরিচিত। এই ফুল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য ফুল ও থাইল্যান্ডের কাঞ্চনাবুরি প্রদেশের প্রাদেশিক ফুল। শিউলি গাছ নরম ধূসর ছাল বা বাকল বিশিষ্ট হয় এবং ১০ মিটারের মতো লম্বা হয়। গাছের পাতাগুলো ৬-৭ সেন্টিমিটার লম্বা ও সমান্তরাল প্রান্তের বিপরীতমুখী থাকে। সুগন্ধি জাতীয় এই ফুলে রয়েছে পাঁচ থেকে সাতটি সাদা বৃতি ও মাঝে লালচে-কমলা টিউবের মতো বৃন্ত। এর ফল চ্যাপটা ও বাদামি হৃদপিণ্ডাকৃতির। ফলের ব্যাস ২ সেন্টিমিটার এবং এটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগে একটি করে বীজ থাকে।

কামিনী: বৈজ্ঞানিক নাম Murraya paniculata. কামিনী সাধারণত কমলা জুঁই (ইংরেজি: orange jasmine, orange jessamine, china box

or mock orange) নামে পরিচিত এক ধরনের ক্রান্তীয়, চিরহরিৎ উদ্ভিদ। যা ছোটো, সাদা, সুবাসিত ফুল জন্মদানের মাধ্যমে শোভাময় বৃক্ষ বা প্রতিবন্ধক হিসেবে বর্ধিত হয়। কামিনী ঘনিষ্ঠভাবে লেবুবর্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং কামকুআট সাদৃশ্য লাল-কমলা আকারের ছোটো ফল বহন করে তবে কিছু প্রজাতি ফল উৎপাদন করে না।

মল্লিকা: ইংরেজি Arabian jasmine, বৈজ্ঞানিক নাম Jasminum sambac. জেসমিন গণের এক প্রকারের সুগন্ধী সাদা ফুল। এর আরেক নাম বেলি। এই প্রজাতির গাছের উচ্চতা এক মিটার হতে পারে। এদের কচি ডাল রোমশ। পাতা একক, ডিম্বাকার, ৪-৮ সেমি লম্বা হয়। পাতা গাঢ়-সবুজ এবং মসৃণ। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় একটি থোকায় কয়েকটি ফুল ফোটে।

গন্ধরাজ: বৈজ্ঞানিক নাম Gardenia jasminoides এটি বাংলাদেশ ও ভারতে খুবই পরিচিত একটি ফুল। এই ফুলটির ইংরেজি নাম gardenia এবং অন্য নাম কেপ জেসমিন। গন্ধরাজ ফুলের ইংরেজি নামকরণ করা হয় একজন বিখ্যাত আমেরিকান প্রকৃতিবিদ ড. আলেকজেন্ডার গার্ডেন (১৭১৩–১৭৯১) এর নাম অনুসারে।

ছাতিম: ইংরেজি Blackboard Tree অথবা devil's tree 'অ্যাপোসাইনেসি' বর্গের অন্তর্ভুক্ত

একটি উদ্ভিদ যার বৈজ্ঞানিক নাম Alstonia scholaris, Echites scholaris L. Mant., Pala scholaris L. Roberty। এর আদি নিবাস ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের এই গাছটি বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র জন্মে। আর্দ্র, কর্দমাক্ত, জলসিক্ত স্থানে ছাতিম বেশি জন্মে। ছাতিম মূলাবর্তে সাতটি পাতা একসঙ্গে থাকে বলে সংস্কৃত ভাষায় একে 'সপ্তপর্ণ' বা 'সপ্তপর্ণা' নামে ডাকা হয়। ছাতিম গাছ হলো পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য উদ্ভিদ।

রাজঅশোক: বৈজ্ঞানিক নাম Saraca asoca, Saraca indica. ইংরেজি Yellow Ashok, Yellow Saraca. অশোক হচ্ছে Fabaceae পরিবারের এক প্রজাতির বৃক্ষ। এটি কখনও কখনও ভুলভাবে Saraca indica হিসেবে পরিচিত। অশোক গাছের ফুল ভারতের ওড়িশার রাজ্যের রাজ্য ফুল। এটি মাঝারি আকৃতির ছায়াদানকারী চিরসবুজ বৃক্ষ। এদের পাতার রং গাঢ়-সবুজ। পাতাগুলো দীর্ঘ, চওড়া ও বর্শাফলাকৃতির। কচিপাতা কোমল, নমনীয়, ঝুলন্ত ও তামাটে। ফুল ফোটার প্রধান মৌসুম বসন্তকাল। তবে হেমন্ত অবধি এ গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে। তবে শীতকালেও এরা অল্প সংখ্যায় ফুটে থাকে। অশোক ফুল গাছের কাণ্ড থেকে ফোটে। ফুল আকারে ছোটো, কিন্তু বহুপৌষ্পিক, ছত্রাকৃতি। মঞ্জুরি আকারে বড়ো। অজস্র ফুলের সমষ্টি অশোকমঞ্জুরি মৃদু গন্ধযুক্ত এবং বর্ণ ও গড়নে আকর্ষণীয়। তাজা ফুলের রং কমলা, কিন্তু বাসি ফুল লাল রং ধারণ করে। পরাগকেশর দীর্ঘ। ফল বড়োসড়ো শিমের মতো চ্যাপটা, পুরু এবং ঈষৎ বেগুনি রঙের।

দেবকাঞ্চন বা রাঙা কাঞ্চন: বৈজ্ঞানিক নাম Phanera purpurea. এটি হচ্ছে Fabaceae পরিবারের একটি উদ্ভিদ প্রজাতি যার আদি নিবাস চীন (অন্তর্ভুক্ত হংকং) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। দেবকাঞ্চন ছোটো থেকে মাঝারি আকারের পর্ণমোচী বৃক্ষ, ৮-১০মিটার উঁচু, মাথা ছড়ানো। পাতা মাথার দিকে ২-বিভক্ত, লতির আগা চোখা বা ভোতা। ফুল ৬-৮ সে.মি. চওড়া, সুগন্ধিযুক্ত সাদা বা বেগুনি। কয়েকটি একত্রে একটি ডাঁটায় ফোটে সারা গাছ ভরে। অসমান ও লম্বাটে ৫টি পাপড়ি। শুঁটিগুলো শিমের মতো ৩০ সে.মি. লম্বা। এতে ১২ থেকে ১৬টি বীজ থাকে। চৈত্র মাসে নিষ্পত্র গাছে ঝুলন্ত ফলগুলো সশব্দে ফেটে বীজ ছড়ায়।

হিমঝুরি: ইংরেজি Millingtonia, বৈজ্ঞানিক নাম Millingtonia hortensis. হিমঝুরি গণের একমাত্র প্রজাতি। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের

স্থানীয় গাছ। হিন্দিতে এটি আকাশনিম বা আকাশমল্লি নামেও পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর বাংলা নাম দেন হিমঝুরি। হিমঝুরি সুউচ্চ চিরসবুজ বৃক্ষ। খাঁড়া ডালপালায় নোয়ানো আগা, ছোটোখাটো ডালের মতো সরু পত্রিকাবহুল পক্ষাকার যৌগপত্র। ফুল মধুগন্ধী, ফোটে রাতে, ভোরের আগেই ঝরে পড়ে। ফুলগুলো সাদা ও নলাকার। নলমুখে বসানো থাকে পাঁচটি খুদে পাপড়ির একটি তারা। ফাঁকে ফাঁকে আছে পাঁচটি পরাগধনী, যেন সযত্নে বসানো রত্নপাথর, সাদা বা হলুদ; গর্ভকেশরযুক্ত। ফলগুলো সরু, লম্বা, আগা ও গোঁড়া ছুঁচালো, সরু সরু পক্ষল বীজে ভরাট, এক ফুট বা ততধিক দীর্ঘ। ■

[তথ্য সূত্র: উইকিপিডিয়া]

কবি ও কথাসাহিত্যিক

হেমন্তের ফল

শাখাওয়াত হোসেন

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের বাংলাদেশ। লাল-সবুজের বাংলাদেশকে ঘিরে প্রতি দু'মাস অন্তর একটি ঋতু আসে। হেমন্ত হলো চতুর্থ ঋতু, যা কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস নিয়ে গঠিত। হেমন্ত মানেই শিশিরস্নাত প্রহর। শরতের কাশফুল মাটিতে নুইয়ে পড়ার পরপরই হেমন্তের আগমন। ঋতু পরিবর্তনের রয়েছে যেমন নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা, তেমনি আছে প্রতিটি ঋতুর স্বতন্ত্র সৌন্দর্যতা। এ সৌন্দর্য বিমোহিত করে প্রতিটি মানুষকে। তাই এ দেশটিকে দেখতে চলে আসেন বিভিন্ন বিদেশি পর্যটকগণ। লাল-সবুজের প্রিয় আঙিনায় তারা ছুটে চলে আর ক্যামেরা বন্দি করে। যার প্রতিটি ধুলিকণা সোনার মতোই দামি। ফুল, ফল ও ফসলের উর্বরভূমি প্রিয় বাংলাদেশ। আর এ ষড়ঋতুর অনন্য ঋতু হলো রূপের রানি, সুখের বাণী পরম প্রিয় হেমন্তকাল। ভোরে ধানগাছের ডগায় জমা শিশির মায়াবী রূপের সৌন্দর্যেরই পূর্বাভাস জানায়। গাছের নরম-কচি পাতাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে মিষ্টি রোদ আর সুনীল আকাশ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।

বাংলার মাটি অত্যন্ত উর্বর। ফলে অল্প পরিশ্রমেই ফলমূল ফলানো যায়। বছরে ছয়টি ঋতু প্রকৃতিকে আপন মনে সাজিয়ে নেয়। উপহার দেয় রূপ, রস ও গন্ধেভরা সুস্বাদু বিভিন্ন ফল। এ হেমন্তকে তাই উৎসবের ঋতু বললেও ভুল হবে না। হেমন্তে বিভিন্ন ধরনের ফলের সমারোহ ঘটে। এর বিশেষ কিছু ফল হলো কামরাঙা, চালতা, আমলকি ও ডালিম। নারিকেল এ ঋতুর প্রধান ফল। ঘরে ঘরে নতুন চালের গুড়োর সাথে নারিকেলের পিঠা সবাই তৈরি করে। এ পিঠা এ বাড়ি ও বাড়ি বিতরণ করে। যা রসনায় তৃপ্তিসাধন করে। বন্ধুরা এসো জেনে নেই হেমন্তের ফলগুলোর কথা–

কামরাঙা: ইংরেজি নাম Carambola এছাড়াও Starfruit নামেও পরিচিত। ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা অঞ্চলের এক ধরনের স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদের ফল। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২ থেকে ৬ ইঞ্চি (৫.১ থেকে ১৫.২ সেমি) এবং উপবৃত্তাকার আকৃতির হয়। এর সাধারণত পাঁচটি ঢাল থাকে, দেখতে তারকাসাদৃশ। কামরাঙার ত্বক পাতলা, মসৃণ এবং পরিপক্ব অবস্থায় অন্ধকার হলুদাভ হালকা। কামরাঙায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস ও ভিটামিন রয়েছে, যা ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখবে এবং ত্বক দাগমুক্ত রাখবে। কামরাঙা ব্রণ দূর করতে বেশ কার্যকর। সমান পরিমাণ কামরাঙার রসের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলবে, ধীরে ধীরে ব্রণ দূর হয়ে যাবে। চোখের নিচের ফোলাভাব দূর করে। তবে যাদের কিডনির সমস্যা আছে তারা এ ফল এড়িয়ে যাবে।

চালতা: একে চালতা বা চালিতা বা চাইলতে নামেও ডাকা হয়। বৈজ্ঞানিক নাম Dillenia indica

ইংরেজি নাম Elephant Apple. এক রকমের ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ। গাছটি দেখতে সুন্দর। জন্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশে জন্মে। এ গাছ উচ্চতায় ১৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। চালতার সাদা রঙের ফুল দেখতে খুবই সুন্দর। ফুলের ব্যাস ১৫-১৮ সেন্টিমিটার। ফল টক বলে এ ফলের আচার, চাটনি, টক ডাল অনেকের প্রিয় খাদ্য। পাকা ফল মাখানো লোভনীয়। গাছ বাঁচে কম-বেশি ২৫-৩০ বছর। জ্বর, বাতের ব্যথা, আমাশয়, কফ ও সর্দি নিরাময়ে ভালো কাজ করে। তাছাড়াও মুখে ঘা কিংবা চামড়া উঠে গেলে এটি খেলে তাড়াতাড়ি সারে। এতে আছে ভিটামিন সি ও প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।

আমলকী : বৈজ্ঞানিক নাম: Phyllanthus emblica ইংরেজি নাম amla বা Indian

gooseberry. আমলকী গাছ ৮ থেকে ১৮ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট। এটি পাতা ঝরা প্রকৃতির ও হালকা সবুজ। ফল হালকা সবুজ বা হলুদ ও গোলাকৃতি। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে পাওয়া যায়। এছাড়াও ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, কম্বোডিয়া, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যায়। এটি ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং অস্টিওপোরোসিস রোগে আমলকির রস কাজ করে। এছাড়াও ডায়াবেটিস, ক্যানসার, প্রদাহ এবং কিডনি রোগে ভালো কাজ করে। রক্তের কোলেস্টেরল-মাত্রা হ্রাস করে আমলকী। এতে প্রচুর ভিটামিন-সি বা এস্করবিক এসিড থাকে। আমলকীর ভেষজ গুণ রয়েছে অনেক। ফল ও পাতা দুটিই ব্যবহার করা যায়। আমলকী খেলে মুখের রুচি বাড়ে। দন্তরোগ সারাতে টাটকা আমলকী ফলের জুড়ি নেই। এছাড়া পেটের পীড়া, সর্দি, কাশি ও রক্তহীনতার জন্যও খুবই উপকারী।

ডালিম: এটি বেদানা, আনার নামেও পরিচিত।

বৈজ্ঞানিক নাম: Punica granatum, ইংরেজি নাম: pomegranate। হিন্দুস্তানি, ফার্সি ও পশতু ভাষায় একে আনার বলা হয়। কুর্দি ভাষায় হিনার এবং নেপালি ভাষায় বলা হয় দারিম। বেদানা গাছ গুল্ম জাতীয়, ৫-৮ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পাকা ফল দেখতে লাল রঙের হয়। ফলের খোসার ভিতরে স্ফটিকের মত লাল রঙের দানা দানা থাকে। সেগুলি খাওয়া হয়। এর আদি নিবাস ইরান এবং ইরাক। সেখান থেকে তা ভারত উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। ডালিম ফল আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী চিকিৎসায় পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ডালিমে বিউটেলিক এসিড, আরসোলিক এসিড রয়েছে। ডালিম হচ্ছে হৃদয়কে ভালো রাখে। রক্তপাত বন্ধে, শরীরের কোনো অংশ কেঁটে রক্তপাত হলে ডালিম ফুল কচলিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে চেপে ধরলে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। ফুল না পেলে পাতাও ভালো কাজ করে। আমাশয় নিরাময়ে ডালিমের কাঁচা খোসা এবং শুকনা খোসা দুটোই কার্যকরী। তাই ডালিম খেয়ে খোসা ফেলে না দিয়ে শুকিয়ে ঘরে রেখে দেওয়া ভালো। ডালিম খেলে শরীরে রক্ত বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক ইনসুলিন ডালিম ডায়াবেটিসের জন্য উপকারী। ডালিম গাছ, ফল, ফলের খোসা, পাতা থেকে শুরু করে শিকড় পর্যন্ত কোনোটাই ফেলনা নয়। আগাগোড়া মানুষের উপকারী। ■

সহ-সম্পাদক, দেশকণ্ঠ

হিম-কুয়াশার হেমন্ত

কামরুল আলম

শরতের সাদা কাশফুল ও স্নিগ্ধ হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আসে হেমন্ত। থাকে না পাখির গুঞ্জন, বর্ষার রিমঝিম শব্দ, কোকিলের কুহুকুহু গান। চোখ জুড়ানো মন মাতানো ফুলের বাহার না থাকলেও ফুলের সৌরভে সুরভিত হয় হেমন্তের দিনগুলো। এ ঋতুতে ফোটে গন্ধরাজ, মল্লিকা, শিউলি, শাপলা, পদ্ম, কামিনী, হিমঝুরিসহ নাম না জানা হরেক রকম ফুল। বসন্তকে ঋতুর রাজা বলা হয়। আর হেমন্তকে? হেমন্তকে বলা হয় ঋতুর রানি।

হেমন্তে গ্রামবাংলায় আসে বৈচিত্র্যময় সাজ। ধানগাছের ডগায় জমে থাকে শিশির বিন্দু। শিশিরভেজা ধানক্ষেতের আলপথ ধরে বিলে মাছ ধরতে ছুটে যায় শিশু-কিশোরের দল। । এক সময় বাংলায় বছর শুরু হতো হেমন্ত দিয়ে। বর্ষার শেষদিকে বোনা আমন-আউশ শরতে বেড়ে ওঠে। আর হেমন্তের প্রথম মাস কার্তিকে পরিপক্ক হয় ধান। অগ্রহায়ণে ফসল ঘরে তোলা হয়। বলা হয়ে থাকে, 'মরা' কার্তিকের পর আসে সর্বজনীন লৌকিক উৎসব 'নবান্ন'। হেমন্তের ফসল কাটাকে কেন্দ্র করেই নবান্ন উৎসবের সূচনা হয়। নবান্ন মানে নতুন অন্ন। বাংলার ঐতিহ্যবাহী 'শস্যোৎসব'। নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষ্যে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ফসল তোলার পরদিনই নতুন ধানের নতুন চালের ফিরনি-পায়েস অথবা ক্ষীর তৈরি করে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে বিতরণ করা হয়। নবান্নের উৎসবে আয়োজন করা হয় আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। লাঠি খেলা, বাউল গান, নাগরদোলা, শখের চুড়ি, খৈ, মোয়ার ইত্যাদি পসরা বসে গ্রাম্য মেলায়।

হেমন্তের প্রথম ভাগে শরৎ-এর অনেক বৈশিষ্ট্য থেকে যায়। দুই ঋতুকে আলাদা করা প্রায় সময় কঠিন হয়ে যায়। এ সময় আকাশ থেকে খণ্ড খণ্ড মেঘ সরে যায়। আমরা দেখতে পাই এক বিশাল নীল আকাশ, যে আকাশের দিকে তাকালে আমাদের মন উদার ও প্রশস্ত হয়। কবির ভাষায়-

'হেমন্তের এই আকাশখানি
কী যে গাঢ় নীল-
বুঝতে হলে থাকতে হবে
আকাশসম দিল!'

খাল-বিল, নদী-নালা আর বিল জুড়ে দেখা যায় সাদা-লাল শাপলা আর পদ্ম ফুলের মেলা। নদী ও হাওর-বিলের পানি বেশ নেমে যায়। তখন জেলেরা একটি ভিন্ন আনন্দের অনুভূতিতে মাছ ধরা শুরু করে। শান্ত নদীতে ভেসে চলে এক বা একাধিক নৌকা। এমন দৃশ্য কার না ভালো লাগে!

হেমন্তের শেষদিকে দূর দেশ থেকে দলবেধে ছুটে আসে অতিথি পাখি। শীত বা তুষারপ্রবণ অঞ্চল থেকে এসব পাখি ছুটে আসতে শুরু করে আমাদের দেশে কিছুটা উষ্ণতার আশায়।

কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের কাব্য-ছড়ার উপকরণ হিসেবে বাংলার ঋতু বৈচিত্র্যকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন। আর হেমন্ত, সে তো ঋতুর রানি! তাকে নিয়ে ছড়া-কবিতা না লিখে থাকা যায়? আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতায় হেমন্তের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে–

'ঋতু খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণীর সওগাত?
নবীন ধানের অঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হলো মাৎ।
'গিন্নি পাগল' চালের ফিরনী
তন্তরী বরে নবীনা গিন্নি
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশিতে কাঁপিছে হাত
শিরনি রাঁধেন বড়বিবি, বাড়ি গন্ধে তেলেসমাত।'

হেমন্ত প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গেলে নীল আকাশ, নদীকূলের কাশফুল, মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে সাদা বকের ওড়াউড়ি, শিউলি ফুলের মনকাড়া সৌন্দর্য্য, নতুন ধানের মৌ মৌ গন্ধ, হেমন্তের সকালে খালি পায়ে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটলে শিশিরের শীতল স্পর্শে ভেজা পায়ে এক ধরনের শিহরণ অনুভূত হয়। আর তাই তো ছড়াকার তখন এইভাবে ছড়া কাটে–

'শিশির ভেজা ঘাসের ডগা
মাঠে সোনার ধান
কী অপরূপ হেমন্তকাল
আল্লাহতায়ালার দান।'

কে ডেকে আনে এই হেমন্তকে? সবুজ পাতার খামে করে হলুদ গাঁদা চিঠি পাঠিয়ে কে ডেকে আনলো প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যঘেরা এই ঋতুরানিকে। হেমন্তের বর্ণনা দেওয়ার পাশাপাশি কবি সুফিয়া কামালের মনে এই প্রশ্নটাও উঁকি দেয়-

'সবুজ পাতার খামের ভেতর
হলুদ গাঁদা চিঠি লেখে
কোন্ পাথারের ওপার থেকে
আনল ডেকে হেমন্তকে।...

আগে হেমন্তকালকে বলা হতো 'হিমঋতু'। আর শীতকালের নাম ছিল 'শিশির'। বিষয়টা অনেক মজার, তাই না বন্ধুরা? না জানা জিনিস নতুন করে

জানলে সবারই মজা লাগে। হেমন্তের সোনালি ধানের গন্ধ চারদিকে থাকতে থাকতেই শীত এসে যায়।! হেমন্তের রোদেলা দুপুরে ধীরে ধীরে ধানের শীষে সোনা রং ধরে। সোনালি রঙে মাখামাখি হয়ে যায় তখন চতুর্দিক। গ্রামবাংলার দৃশ্যপট সত্যি অন্যরকম হয়ে যায়। মাঠে মাঠে দোল খায় ধানের শীষ! কবির ভাষায়-

'ধানের শীষে দোল খেয়ে যায়
এই তো মাঠের ছবি
মিষ্টি রোদও দেয় ছড়িয়ে
হেমন্তের ওই রবি।'

সত্যিই হেমন্ত এক চমৎকার ঋতু। কবি তাই হেমন্তকে অন্যচোখে দেখেন–

'গ্রীষ্মকালে গরম জ্বালায়
বর্ষাকালে বৃষ্টি
শরৎ এবং হেমন্তকাল
নেয় কেড়ে নেয় দৃষ্টি!'

হেমন্তকাল মানেই ফসলের ছড়াছড়ি। মাঠে ধান পাকে, বাড়ির আঙিনায় বা উঠোনের মাচানে লাউ কুমড়াগুলো লক লক করে বেড়ে ওঠে। মিষ্টি রোদের মায়াময় দিনে নানা রঙের পাখিদের ডানা ঝাপটানো দেখা যায় গাছে গাছে। হেমন্তের নরম রোদের ছোঁয়া সবাই পেতে চায়। একসময় দিন গড়িয়ে বিকেল হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সকালে বের হওয়া পাখিরা নীড়ে ফিরতে শুরু করে দল বেধে। তাদের কিচিরমিচির ধ্বনির সঙ্গে যোগ হয় বাঁশঝাড় থেকে আসা এক ধরনের শিরশির শব্দ। তৈরি হয় অন্যরকম এক সুরের আবেশ।

হেমন্তে রাতের আকাশে দেখা যায় অগণিত তারার মেলা। বিস্তৃত দিগন্তের কোথাও এক বিন্দু জমাটবাঁধা মেঘেরও দেখা মেলে না। মিটিমিটি তারা জ্বলে সারা রাত। সেই সঙ্গে চাঁদের শরীর থেকেও জোছনা ঝরে পড়ে পৃথিবীজুড়ে। ঝিরিঝিরি বাতাস আর মৃদু আলোর ঝলকানিতে তৈরি হয় মায়াময় এক রাত। এককথায় বলতে গেলে প্রতিবছরই আমাদের মাঝে হিম-কুয়াশার চাদর নিয়ে হেমন্তকাল আসে। ■

প্রাবন্ধিক

এল হেমন্ত

মুহিবুল হাসান

কচি ধানের ডগায় ডগায়
শিশির কনা ভাসে
শীতের আমেজ নিয়ে
বাংলায় হেমন্ত আসে।
ঢেউ খেলে যায় বাতাস
সোনালি ধানের ক্ষেতে
কৃষান কৃষানি গায় গান
মনের আনন্দেতে।
বাংলার ঘরে ঘরে
নবান্নের উৎসব
নানান স্বাদের পিঠা খেয়ে
খুশিতে মন তৃপ্ত সব।

প্রকৃতির সৌন্দর্য

মো. রিজন মিয়া

প্রকৃতির সৌন্দর্য যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে
হারাতে ইচ্ছে করে মেঠো পথের বাঁকে।
বহুদূর পাড়ি দিয়ে হিমালয় জয়ের নেশায়
প্রকৃতির মাঝে নিজেকে ফিরে পাবার আশায়।
প্রকৃতির কাছে যে শান্তি পাই
পৃথিবীর অন্য কোথাও তা নাই
প্রকৃতির সৌন্দর্যে প্রফুল্ল চারধার
প্রকৃতির মাঝে হারাতে মন চায় বারবার।
প্রকৃতি মানবের তরে মায়ের মতো হয়
তাই তো প্রকৃতির মাঝে হারাতে নেই কোনো ভয়।
যখনি মানুষ প্রকৃতির কাছে যায়
তখনি সে নিজেকে খুঁজে পায়।

সাদা মেঘের ভেলা

আজহার মাহমুদ

শিউলি ফুলের মন মাতানো সুবাস যখন আপনার আঙিনায় ছেয়ে থাকে তখনই হেমন্তের শুরু! শুধু কি শিউলি ফুল? দোলনচাঁপার হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সুগন্ধ আমাদেরকে হেমন্তকালে আবদ্ধ করে রাখার জন্য যথেষ্ট। হেমন্তকালকে অনেকে বলে ঋতুর রানি। এই ঋতুর সৌন্দর্যের প্রাচুর্য বিশাল। সেই বিশালতা তাকে এই খ্যাতি দিয়েছে। শরৎকাল বর্ষার কিছুটা পরে আসে। শরতের শেষ ভাগে এসে বৃষ্টি কিছুটা কমতে থাকে। সারি সারি মেঘ ভেসে বেড়ানো আকাশের গায়ে এসে পড়ে কুয়াশার আলতো স্পর্শ। হেমন্তের শুরুটা সেখান থেকেই।

হেমন্তকালের সেরা একটা দৃশ্য হচ্ছে মেঘের রাজ্যে টুকরো টুকরো নীলকে হারিয়ে যেতে দেখা। একদিকে কাশফুলে ছেয়ে যায় মাটি, অন্যদিকে সাদা মেঘে ভরে যায় আকাশ। মেঘের ভেলায় বাস্তবে হারিয়ে যেতে হলে খোলামেলা কোনো জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেন। যেখান থেকে দূরের আকাশ যেন মনে হবে খুব কাছে।

হেমন্তকালের খাবারেও আছে বেশ বৈচিত্র্য। পুরনো এবং মজাদার খাবারের সমাহার থাকে এই ঋতুতে। মানুষ সারা বছর অপেক্ষা করে এই ঋতুর খাবারগুলোর জন্য। যারা খেতে ভালোবাসেন তারা হলফ করে বলতে পারবেন, এ সময়ের খাবারগুলো কতটা সুস্বাদু ও মজাদার। নানান রকম পিঠা পুলি আর খাবারের আয়োজন থাকে এ ঋতুতে। ফসল কাটার পরপরই নিজ হাতে সময় নিয়ে বানানো হয় এই পিঠাগুলো তাই স্বাদে এতটা চমৎকার।

হেমন্তকালে চারদিকে একটু খেয়াল করলেই এই ঋতুর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারা যায়। এতটা স্নিগ্ধতা চারিদিকে বিরাজ করে যে তার মোহ কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। বছরের এই ঋতুতে জেলেদের মুখেও ফুটে ওঠে অকৃত্রিম হাসি।

এছাড়াও গরমের প্রখরতা হেমন্তের শীতল আবেশে শেষ হয় বলেই এই ঋতুটা মন ও চোখের জন্য এতটা শান্তিময়। এই সুন্দর সময়টা অতিক্রম করলেই সামনে অপেক্ষা করছে শীতকাল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকালের মেয়াদটা দীর্ঘ বলেই মনে হয়। কেবল এই তিনটা ঋতুই আছে আসলে তা নয়! অল্প সময়ের জন্য ঘুরতে এলেও হেমন্তের প্রভাব থাকে সকলের হৃদয়ে। অনেকেই অপেক্ষা করে এবং সময় নিয়ে উপভোগ করে। কবি নজরুলের ভাষায় বলতে চাই,

'সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়
নবীন আমন ধানের ক্ষেতে,
হেমন্তের ঐ শিশির-নাওয়া হিমেল হাওয়া
সেই নাচনে উঠলা মেতে।'

রিপোর্টার, চট্টগ্রাম সময়

হেমন্তের সকাল

নূরে আলম সিদ্দিকী শান্ত

হিম বাতাসে ভেসে আসে,
শিউলি ফুলের ঘ্রাণ।
শিশির ভেজা স্নিগ্ধ সকাল,
আকুল করে প্রাণ।
কুয়াশার জাল ছেয়ে থাকে,
মাঠের চারিপাশে।
পুব আকাশে ভোরের রবি,
অল্প আলোয় হাসে।

নদীর ধারে উড়ে বেড়ায়,
সাদা বকের দলে।
দূর্বাঘাসে হাঁটতে গিয়ে,
পা ভিজে যায় জলে।

মিষ্টি রোদের ঝলসানিতে,
মন ভরে যায় সুখে।
বাড়ির কোণে হলুদ গাঁদা,
ফুটে হাসি মুখে।

হেমন্তে মেতে উঠে

সরোয়ার রানা

সোনা ঝরা পাকা ধান
মাঠে মাঠে ভরা
কি দারুণ রঙে-রূপে
দিলে তুমি ধরা ।

ঝাঁকে ঝাঁকে তোতা পাখি
ধানে দেয় হানা
মাঝে মাঝে হাতি আসে
করবে কে মানা?

হেমন্তে মেতে উঠে
পশু আর পাখি
সোনা রোদে উড়ে উড়ে
যায় শুধু ডাকি।

ঝলমলে সোনা রোদে
জেগে ওঠে প্রাণ
চারিদিকে বেজে ওঠে
কত সুরে গান।

হেমন্তের সুখ

জহির টিয়া

গাঁয়ের পথে হাঁটতে গিয়ে
নতুন ধানের গন্ধে,
হৃদয় নাচে উথালপাতাল
তাক ধিনা ধিন ছন্দে।

কৃষক ভাসে সুখের ভেলায়
ঘরে নতুন ধান,
সন্ধ্যেরাতে গাইতে বসে
নবান্নেরই গান।

এই বাড়িতে ওই বাড়িতে
সব বাড়িতে চলে,
নতুন ধানের নতুন খাবার
হিম হাওয়াতে বলে।

ঘরে ঘরে খুশির আমেজ
সব ঋতুতে আসুক,
দুঃখ-গ্লানি মুছে দিয়ে
বাংলাদেশটা হাসুক।

দুর্গম যাত্রা

শেখ তাওসীফ বিন হাবিব

স্বপ্ন আমার ছুঁয়েছে গগন,
মেলছে ডানা যখন তখন।
করতে হবে আমাকে অসাধ্য সাধন,
কিন্তু পারছি না ভাঙতে ভীতির বাঁধন।
নব নব আশা ঘিরে ধরেছে মন,
পাচ্ছি ভয় নিজেকে করতে সমর্পণ।
এখন আর থামা নয় সম্ভব,
তাই বেরিয়েছি আমি করতে অসম্ভব।
আঁধার না আলো, জানি না আছে কী সামনে
তবুও এগিয়ে যাব আমি হৃদয়ের স্পন্দনে স্পন্দনে।
পথ যতই পাড়ি দিই না কেন
সেটা হবে না পর্যাপ্ত,
কেননা আমার বিশ্বাস
শেষ নিশ্বাসই পারে করতে
আমার যাত্রা সমাপ্ত।

একাদশ শ্রেণি
সবুজবাগ সরকারি কলেজ, ঢাকা

হেমন্ত

হুমায়ুন আবিদ

সরষে ক্ষেতের হলদে শাড়ি শিশির ছোঁয়া পেয়ে
ঝির বাতাসে দোলে উঠে আনন্দে গান গেয়ে।

সোনাবরণ ধানের গন্ধ গাঁয়ের মাঠে ভাসে
নতুন ধানের ছোঁয়ায় কৃষক দুঃখ ভুলে হাসে।

শিশিরকণা মুক্তো সাজে ঘাসের বুকে জ্বলে
অসীম নীলে পাখপাখালি সুখে ওড়ে চলে।

হিম মাখানো চাদর গায়ে হেমন্ত হাটে
নবান্নে ধান কাটতে কৃষাণ ব্যস্ত থাকে মাঠে।

সূর্য মামা তেজ হারিয়ে শীতের প্রহর গুনে
শিউলী ছাতিম ফুলের গন্ধ স্বপ্ন হাজার বুনে।

নতুন চালের পিঠা পায়েস সবার ঘরে থাকে
হেমন্ত এলেই দেশে সুখের ছবি আঁকে।

বাংলার হেমন্ত

বিজন বেপারী

পাক ধরেছে ধানের ক্ষেতে
সোনালি সব ধান,
কৃষক চাষি ডাকে হেঁকে
দড়ি কাঁচি আন।
নতুন ধানের উৎসব হবে
হবে যে নবান্ন,
সেই খুশিতে সাজবে পাড়া
মহা খুশির জন্য।
শীতের বুড়ি আসবে ধেয়ে
হিমালয়ের থেকে,
শীতের এমন আগমনে
প্রকৃতি যায় বেঁকে।
কুয়াশায় ঘেরা ভোর বেলা
শিশির ভেজা পাতায়,
গাঁদা ফুলের গন্ধ ছড়ায়
প্রজাপতির পাখায়।
নব পল্লবে ভরবে মাঠ
শীতের যত কৃষি,
শুভ বার্তা ঘরে আনুক
বাংলার প্রতি চাষি।

বিচিত্র রঙে শস্যোৎসব

সেলিনা আক্তার

বৈশাখি ঝড়, বর্ষার বৃষ্টি, কাশফুলের সুশোভিত শরৎ পেরিয়ে প্রকৃতিতে এখন হেমন্ত। ষড়ঋতুর চতুর্থ ঋতু হেমন্ত। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের সমন্বয়ে হেমন্তের বসবাস। এর পরেই শীত তাই হেমন্তকে বলা হয় শীতের পূর্বাভাস। কৃত্তিকা ও আর্দ্রা এ দুটি তারার নাম অনুসারে নাম রাখা হয়েছে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের। 'মরা' কার্তিকের পর আসে সর্বজনীন লৌকিক উৎসব নবান্ন। 'অগ্র' ও 'হায়ণ' এ দু অংশের অর্থ যথাক্রমে 'ধান' ও 'কাটার মৌসুম'। সম্রাট আকবর অগ্রহায়ণ মাসকেই বছরের প্রথম মাস বা খাজনা তোলার মাস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এক সময় বাংলায় বছর শুরু হতো হেমন্ত দিয়ে। কারণ, ধান উৎপাদনের ঋতু হলো এই হেমন্ত। বর্ষার শেষ দিকে বোনা আমন-আউশ শরতে বেড়ে ওঠে। আর হেমন্তের প্রথম মাস কার্তিকে ধান পরিপক্ক হয়। এ ঋতুতে ফোটে গন্ধরাজ, মল্লিকা, শিউলি, কামিনী, হিমঝুরি, দেবকাঞ্চন ও রাজঅশোক।

হেমন্তের ফসল কাটাকে কেন্দ্র করেই নবান্ন উৎসবের সূচনা হয়। নবান্ন (নতুন অন্ন) পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব। নবান্ন হলো নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসব, যা সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান পাকার পর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ফসল তোলার পরদিনই নতুন ধানের নতুন চালে ফিরনি-পায়েস অথবা ক্ষীর তৈরি করে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে বিতরণ করে। নবান্নে জামাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়, মেয়েকেও বাপের বাড়িতে 'নাইওর' আনা হয়।

নবান্নে নানা ধরনের দেশীয় নৃত্য, গানবাজনাসহ আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। লাঠিখেলা, বাউল গান, নাগরদোলা, বাঁশি, শখের চুড়ি, খৈ, মোয়ার পসরা বসে গ্রাম্য মেলায়।

ইউরোপে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে হেমন্তের শুরু। সেখানে একে বলা হয় বৈচিত্র্যময় রং ও পাতা ঝরার ঋতু। ঝাউ গাছগুলো ছাড়া সব গাছেরই পাতা এ সময় ঝরে যেতে শুরু করে এবং শীতের আগমনের আগেই সব বৃক্ষ ন্যাড়া হয়ে যায়।

আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে ষড়ঋতুর মধ্যে চারটি ঋতুর উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। আর বাকি দুটি ঋতু হেমন্ত ও বসন্ত প্রকৃতি থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছে।

বিকেলবেলা হাঁটতে হাঁটতে শীতের একটা হিমেল আমেজ পাওয়া যায়। তেমনি শীতের আমেজ বহন করে হেমন্ত।

নগর জীবনের কোলাহল থেকে একটু হাওয়া বদল করতে চাইলে হেমন্তই উত্তম সময়। গ্রামীণ পরিবেশে কয়েকদিন কাটালে হেমন্তের আসল রূপ-রস পাওয়া যাবে। মনটা ভরে উঠবে হেমন্তের বিচিত্র রঙে। ■

কবি ও সাংবাদিক

গল্প

হেমন্তের চিঠি

মোস্তাফিজুল হক

হেমন্ত দুপুর। মুমু জানালার পাশে বসে আছে। ধান কাটা শেষ। অদূরে দু-একটা ক্ষেতে সর্ষের ফুল ফুটতে শুরু করেছে। কোথাও কোথাও নতুন সবজি চাষে বিবর্ণ মাঠ সবুজ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বড়ো বড়ো গাছের পাতায় হলদে রঙের আভা। মুমু নীরবে কবি সুফিয়া কামালের বিখ্যাত কবিতাটা পড়তে থাকে–

সবুজ পাতার খামের ভেতর
হলুদ গাঁদা চিঠি লেখে
কোন্ পাথারের ওপার থেকে
আনল ডেকে হেমন্তকে?

ডানপিটেরা দলবেধে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। মুমুরও ঘুড়ি উড়াতে মন চায়। আবার একটু পরেই মনে মনে ভাবে, 'আহা, আমি যদি উড়ন্ত ঘুড়ি হতে পারতাম!'

দরগাতলায় গলা ধরে দাঁড়ানো একটা তেঁতুল ও দুটো তালগাছ। পাশেই একটা পুরানো বটগাছ। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো তালগাছের পাতায় পাতায় ঝুলছে বাবুইয়ের বাসা। মাঠে গরু-ছাগলও চড়ে বেড়াচ্ছে। ছাতার মতো ছায়া বিলানো বটগাছটা বেশ মলিন। তবুও বিবর্ণ পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাখিরা গান ধরেছে। বৌরিপাখি ডালে বসে ঠোঁট ঘষছে। পাখিদের গানে মুগ্ধ দুপুর ফুরিয়ে দ্রুতই বিকেল নেমে এল।

কালচে রঙের ফিঙে মাঠের গরু-ছাগলের পিঠে বসে আছে। মুমু মনে মনে ফিঙেকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওই ফিঙে, তুমি কি পশুদের রাজা নাকি? না, তুমি রাজা হতে যাবে কেন? মুকুট ছাড়া রাজা হবে কী করে? ঐ তো শালিকও বসে আছে গরুর পিঠে। তোমরা আসলে রাখাল পাখি। রাখাল ছেলেও তো মোষের পিঠে বসেই মাঠে মাঠে গরু-মোষ চড়ায়।' তবে এই পশু চড়ানোয় রাজার মতো একটা ভাব আছে।

টুনটুনি, দোয়েল আর ফটিকজল চড়া গলায় গান ধরেছে।

'পুঁচকে টুনটুনির এত্ত চড়া গলা! ছোট্ট ফটিকই বা কী করে এতটা চড়া গলায় গান গায়? আমি কেন এমন গাইতে পারি না!'– মুমু এমনটা ভেবেই বিষণ্ন হয়ে পড়ে।

মুমু নিয়মিতই জানালার পাশে এসে বসে। বসেই ভাবনার অতলে হারায়। এভাবে না বসলে ওর ভালো লাগে না। পাখিদের গান শুনে মনে মনে ভাবে, 'ইশ্! যদি পাখির ভাষা বুঝতে পারতাম!'

মুমুর সাথে পাখিদের হালকা একটা বোঝাপড়া আছে। সে যখন খেতে বসে, তখন জানালায় দুটো দোয়েল

এসে বসে। খেয়েদেয়ে শোবার ঘরে চলে গেলে পাখি দুটো টেবিলে পড়ে থাকা দানাগুলো খুঁটে খুঁটে খায়। বহুদিন ধরেই এমনটা করছে। মুমু হাতের মুঠোয় চাল নিয়ে খেতে ডাকে। আসে না। তখন বিরক্ত হয়। মনে মনে বলে, 'ধুর, বোকা কোথাকার! একদমই আদর নিতে জানিস না!'

মুমুর ভাবনা ফুরোয় না। ওর চোখে সীমাহীন স্বপ্ন। পাখির মতো ডানা মেলে উড়তে চায় সে। তেমনি করেই সুর ধরে গাইতেও চায়। মুমু কখনো কখনো পরিযায়ী পাখি হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেও চায়। সে জানে, তার এই দিবা-স্বপ্ন পূরণ হবে না। তবে কোথায় যেন এ-ও পড়েছে– যারা জেগে জেগে দেখা স্বপ্নকে সফল করতে পারে, জগতে তারাই বড়ো মানুষ হয়ে ওঠে।

ছোট্ট ফটিকজলকে দেখে মুমুর বড্ড বেশি ভালো লাগে। সে 'বাংলাদেশের পাখি' বইয়ে এ পাখি সম্পর্কে পড়েছে। খুব ছোট্ট পাখি হয়েও নিজেদের চেয়ে কয়েকগুণ বড়ো কোকিলের ছানাকে লালনপালন করে! ছানা বেড়ে ওঠার পর ঠিকই চিনতে পারে। তবুও পরভৃত বলে অবহেলা করে না। ওদের কাছে সব ছানাই সমান আদরের। মুহূর্তেই মুমুর মন ভালো হয়ে যায়। সে-ও ভাবে, 'শিশুর সাথে আবার কীসের শত্রুতা?'

মুমু ছুটির বিকেল হলেই জানালার পাশে এসে বসে। তখন ফটিকজল এসে পাতার আড়ালে বসে গান ধরে। চড়া গলায় নানান সুরে গান গায় পাখিটা। একটা সুর ওর কাছে খুব ভালো লাগে। মনে হয়, পাখিটা মুমুর কাছে জানতে চায়, 'কী খা-ই-ছো?'

মুমু ফটিকজলের পরিচয় জানে। খুব সুন্দর করে বাসা বানায় এ পাখি। নারকেল গাছে এক ধরনের নেট হয়। সেই নেটের শক্ত আঁশগুলো ছিঁড়ে নিয়ে গোলগাল আর খুব ছিমছাম বাসা বানায়। বাবুই, টুনটুনি আর চড়ুইয়ের পর এরাও খুব সুন্দর করে বাসা বানায়।

আজও এরকমই ছুটির দিন। মা আর দাদিমা রান্নাঘরে ব্যস্ত। নতুন চালের পিঠা বানাচ্ছেন। একটু আগেই বাবা আখের আর খেজুরের নতুন গুড় এনে দিয়েছেন। দুধপুলি, পানাপিঠা আর মালপোয়া তৈরি হচ্ছে। ভোরে তৈরি হবে ভাপা পিঠা। পিঠার ঘ্রাণ নাকে এলেও রান্নাঘর মুমুকে টানছে না।

গোধূলির রঙে বর্ণিল বিকেল। বাতাসে হিমঝুরি আর ছাতিম ফুলের ঘ্রাণ। মুমুর খুব ভালো লাগছে। ছোট্ট ফটিকজল সুরে সুরে গাইছে– 'হুটিও টিটো, ইউ টিউটো'। থেকে থেকে কত রকমের সুর ছড়িয়ে দিচ্ছে। মুমু এই মুহূর্তে যেন স্বপ্নের জগতে।

'এই মেয়ে, তুমি কি পাখির মতো উড়তে চাও নাকি?'

'শুধু কি উড়তে চাই? আমি তো গাইতেও চাই।'

'তোমরা তো নিজেরাই পাখা বানাতে পারো। ঐ যে দুটো ছোট্ট খোকা ছিল না? কী যেন নাম? মনে পড়েছে– রাইট ব্রাদার্স। সেই ভাইদের বানানো পাখায় কত মানুষ উড়ছে। ভালো করে লেখাপড়া করলে তুমিও তো সেই মস্ত পাখায় ভর করে উড়তে পারবে।'

'জানো ফটিক, আমার তো পড়তে মন চায় না!'

'ঠিকমতো পড়াশোনা না করলে কি জীবনে বড়ো হওয়া যাবে? তোমার বড়ো চাচার কত সম্মান! কত বড়ো চাকরি। বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন। আচ্ছা, পড়াশোনা না করলে কি এসব সম্ভব হতো?

'কিন্তু আমার যে খুব কমই পড়তে ইচ্ছে করে।'

'মুমু, খুব যে বেশি পড়তে হবে, তা কিন্তু নয়। একটু নিয়ম করে বুঝেশুনে পড়বে। তাছাড়া শুধু টেক্সট বইয়ে ডুবে থাকলেই চলবে না– প্রকৃতি, পরিবেশ আর মহৎ মানুষের আত্মজীবনীও পড়তে হবে। চারপাশের খোঁজখবরও রাখতে হবে। তুমি যদি নিয়ম করে পড়ো, তাহলে আমি এসে প্রতিদিন গান শুনিয়ে যাব।'

নদীর জল কত যে সাগরে গড়িয়েছে– কে তার হিসাব রাখে? মুমু এখন আর ছোট্টটি নেই। সে এখন মহাকাশ বিজ্ঞানী। সাতদিন ধরে রাশিয়ার মস্কো শহরে অবস্থান করছে। 'মহাকাশযান ও এর মানোন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালা'য় এসেছে মুমু। মাসব্যাপী কর্মশালা। এতে সে তার গবেষণাপত্র উপস্থাপন করবে।

রাশিয়ায় মুমুর কর্মব্যস্ত দিনগুলো বেশ আনন্দেই কাটছে। সে ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারক মস্কো নগর দেখে নিচ্ছে। সেন্ট বাসিলস ক্যাথেড্রাল ও

রেডস্কয়ারের ভেতর ও বাইরের অনন্য শিল্পকর্ম আর স্থাপত্যশৈলী তাকে ভীষণ মুগ্ধ করছে। রাশিয়ার সরকারি দফতর, ক্রেমলিনের গির্জা, ২৫০ একর জায়গা জুড়ে বিশাল অস্ত্রাগার দেখে নিয়েছে মুমু। জাদুঘর, ডায়মন্ড ফান্ড এক্সিবিশন আর তাতে অলংকারের চমৎকার সংগ্রহ– যে কাউকেই মুগ্ধ করবে। শুধু কি তাই? কর্মশালার ফাঁকে ফাঁকে রাশিয়ার ঐতিহাসিক জাদুঘর রেডস্কয়ারও দেখা হলো তার। সবশেষে এল একটি রূপালি মোহন রাত। এবার টিভিতে দেখা বলসই থিয়েটারের অপেরা আর ব্যালে নাচ সরাসরি উপভোগ করবে মুমু।

স্বপ্ন পূরণের রাতে ভীষণ মুগ্ধতা নিয়ে অপেরা শো আর বেলে নাচ দেখে গেস্ট রুমে ফিরে এল মুমু। ঘুমুতে যাবার আগে আজ তার সেই প্রিয় ফটিকজলের কথা মনে পড়ে গেল। সে তার সোনালি কৈশোরের কথা ভুলতে পারে না। সেসব কথা আজও খুব মনে পড়ে। স্মৃতির মায়াবী পক্ষিরাজে চড়ে মুহূর্তেই সে ফটিকজল আর দোয়েলের দেশে উড়ে গেল।

‘এই মুমু, উঠে পড়ো, অনেক বেলা হয়েছে! ভর সন্ধ্যায় ঘুমিও না। উঠে পড়তে বসো। তোমাকে যে সত্যি সত্যিই অনেক বড়ো মানুষ হতে হবে। তারপর পাখির মতোই আকাশে উড়ে দেশ-বিদেশে ঘুরবে।’ প্রিয় পাখিটা যেন দাদিমার মতোই স্নেহের তরঙ্গ ছড়িয়ে ডেকে চলেছে। মুমু আবারো সেই ডাক শুনতে পেল–

‘এই মুমু, উঠে পড়ো। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।’

ঘুম ভাঙতেই ভীষণ অবাক হলো মুমু। বিজ্ঞানী মুমু আবারও সেই কৈশোরে! ওর মাথার কাছে সেই পুরানো সোভিয়েত পত্রিকা, হাতের কাছে রাখা ওর ক্লাস নাইনের ফিজিক্স বই!

পাখিরা নীড়ে ফিরে গেছে। কোথাও কোনো পাখির কিচিরমিচির নেই।

‘পাখি তো আর মানুষের মতো করে কথা বলতে পারে না। তবে কার ডাকে ঘুম ভাঙল? কোথায় সেই ফটিকজল? আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখলাম?’

‘হোক তা স্বপ্ন, এমন একটা স্বপ্ন যে আমাকে জয় করতেই হবে।’

পাতার আড়াল থেকে তখনই আবারও শব্দ ভেসে এল, ‘টিউ টিউটো’। মুমু যেন সত্যিই শুনতে পেল, ‘নিশ্চয়ই পারবে!’ স্বনির্ভর হেমন্ত যেন মুমুকে জীবন গড়ার এক চিঠি দিয়ে গেল। ■

ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক ও অনুবাদক

বাংলার নবান্ন

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

হেমন্ত নিয়ে লিখতে গিয়ে প্রথমেই কবির দুটি চরণ দিয়ে শুরু করি -

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

কবির বাংলাকে নিয়ে এমন আনন্দ চিত্তে কথাগুলো বলার কারণ হলো, বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এর গঠন প্রকৃতি ও প্রকৃতির লীলাভূমি হিসেবে খ্যাত এই দেশ। এদেশ ষড়ঋতুর দেশ। প্রতিটি ঋতুরই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য আছে। আছে নিজস্ব ধারাবাহিকতা। পৃথিবীর আর কোথাও এমন ছয়টি ঋতুর পর্যায়ক্রমে আগমন আর নেই। একমাত্র বাংলাদেশেই ছয় ঋতু গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত পর্যায়ক্রমে আসে বলে এদেশকে ষড়ঋতুর দেশ বলা হয়। এর মধ্যে হেমন্ত হচ্ছে চতুর্থ ঋতু। শরতের শেষেই হেমন্তের আগমন বার্তা বোঝা যায়। শরতের কাশফুল মাটিতে নুইয়ে পড়ে আর ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু শিশিরকণা জমে থাকতে দেখা যায়। হেমন্তের বৈশিষ্ট্য হলো হালকা শীত শীত ভাব ও গাছের পাতার ওপর বিন্দু বিন্দু শিশিরকণা জমে থাকা। মনে হয় গাছগুলো হাসছে। এমন স্নিগ্ধ প্রভাতের মায়াবী রূপের ঝলকে হেমন্তের আগমন শুরু হয়। হেমন্তকালে দু'টি মাস কার্তিক ও অগ্রহায়ণ। হেমন্ত আসা মানেই বাংলার দরজায় শীত কড়া নাড়ছে আসবে আসবে বলে। হেমন্তের বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো এ সময় বাংলার ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব শুরু হয়। নবান্ন এর অর্থ হলো নব ও অন্ন মানে নতুন খাদ্য। অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকেরা সোনালি ধান কেটে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। গোলায় জমা করে। তারপর ধান ভেঙে চাল তৈরি করা হয়। আর এই চালের ভাতই হলো বাঙালির প্রধান খাদ্য। এই নবান্ন মাসের সঙ্গে এর একটি যুক্তিও আছে।

বাংলার কৃষকেরা দ্বিতীয় ঋতু বর্ষার শেষ দিকে যে আমন-আউশ ধান জমিতে বোনে, শরৎকালে তা আস্তে আস্তে বেড়ে উঠতে থাকে। আর হেমন্তের প্রথম দিকে কার্তিক মাসে ধান পাকতে শুরু করে। সবুজ ক্ষেত সোনালি ধানের মৌ মৌ গন্ধে সোনালি হয়ে ওঠে। অগ্রহায়ণ মাসে এই ধানের ফসল কৃষকেরা ঘরে তোলে। আর এই ফসল ঘরে তোলা নিয়েই বাংলায় নবান্ন উৎসব পালিত হয়।

মোঘল সম্রাট আকবরের সময় প্রথম বাংলা সালের প্রবর্তন করা হয়। তখন তৎকালীন বাংলার পণ্ডিতেরা সময় অনুযায়ী 'অগ্রহায়ণ' মাসকেই বছরের প্রথম মাস হিসেবে ধরেন। কারণ কৃষকেরা তখন ধান বিক্রি করে মালিককে খাজনা দিতে পারত। তাই এই মাসকে খাজনা আদায়ের মাসও বলা হতো। অগ্রহায়ণ এর

পুরো অর্থ– অগ্র মানে খাদ্য বা ধান এবং হায়ণ মানে ফসল কাটার মৌসুম। অর্থাৎ নামের সঙ্গে পূর্ণতা বা মিল রেখেই তৎকালীন পণ্ডিতেরা এ মাসের নাম রেখেছিল অগ্রহায়ণ।

কার্তিক মাসকে বলা হয় মরা কার্তিক। এই সময় ধান পেকে গাছ হেলে পড়ে বলে এমন নাম। এই মরা কার্তিকের পরই জমজমাট পরিবেশে অগ্রহায়ণ মাস শুরু হয়। এ মাসের শুরুতেই বাংলার ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব শুরু হয়। আমন ধান থেকে নতুন নতুন চাল তৈরি করে বাংলার ঘরে ঘরে পিঠা-পুলি, ক্ষীর, পায়েস, ফিরনি খাওয়ার ধুম পড়ে যায় গ্রামীণ সমাজে। আর বিভিন্ন জায়গায় নবান্ন উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা বসে।

নবান্নের মেলাতে শিশুদের নাগরদোলায় চড়া, মাটির খেলনা, পুতুল, চরকি, চুড়ি থেকে শুরু করে মুড়ি চিড়ার মোয়া, খৈ, লাড্ডুসহ অন্যান্য খাবার জিনিসও পাওয়া যায়। বড়োদের জন্য হাঁড়িপাতিলও ওঠে এই মেলাতে। এমনকি এই মেলাতে গানের আসরও বসে। গ্রামীণ পটভূমির গান– ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি ও বাউল গানের আসর বসে এই নবান্ন মেলাতে। গ্রামীণ পটভূমি ছেড়ে শহরেও এখন এই নবান্ন উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপিত হয়। প্রতি বাংলা বছরের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনকে নবান্ন উৎসব হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নবান্নোৎসব উদ্‌যাপন কমিটি। বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আবার ফিরিয়ে আনতেই এখন শহর ও গ্রামের উভয় জায়গাতেই হেমন্তে নবান্ন উৎসব পালিত হয় মেলা আর পিঠা-পুলি, পায়েস খাওয়া শুরুর মাধ্যমে। ■

সাংবাদিক ও শিশু সাহিত্যিক

আমিরা তাবাস্‌সুম, একাদশ শ্রেণি, টঙ্গি সরকারি কলেজ, কলেজগেট, টঙ্গি, গাজীপুর

পৃথার পাঠ

প্রণব মজুমদার

-করছ কী করছ কী? ধরো না। ওসব বুয়া এসে নিয়ে যাবে। এগুলো ঝুটা খাবার।

শিক্ষিকা নাসিমা ম্যামের কথায় কিছুটা আড়ষ্ট হলো পৃথা। শিক্ষক বলে কথা। সম্মান দেখাতেই হয়। অনেকটা ভৃত্যের মতো নরম ভঙ্গিমায় বিনয়ের সঙ্গে পৃথা বলল–

-না ম্যাম খাবারগুলো ঝুটা হয়নি। অন্য কেউ খেতে পারবে। খাবারের যে দাম।

রান্নাঘর থেকে গরম করে আনি ম্যাম?

-ঠিক আছে যাও। দেখো হাত-টাত পুড়ে ফেলো না আবার!

পৃথাকে সাহায্য করার জন্য আসিয়া বুয়াকে ডেকে বললেন ম্যাম।

সহপাঠী তানহাকেও সঙ্গে নিলো পৃথা। রান্নাঘরে গিয়ে বিরিয়ানির প্যাকেটের অবশিষ্ট খাবারগুলো গরম করতে লাগল ওরা।

-এই তানহা, বক্সে রাইসগুলো ভর তো ? ওরে একটু হেলপ করেন না আসিয়া খালা?

তেরোটি বক্সে খাবার সাজানো হলো। তারপর বাক্সগুলোর মুখ আটকিয়ে পৃথা ও তানহা তা নিয়ে এল নাসিমা ম্যামের কাছে। বাইরে ক'জন ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে আছে! যাই ম্যাম, দিয়ে আসি ?

কোচিং সেন্টারে চারজন শিক্ষিকা! সবাই সিদ্ধেশ্বরীর নামকরা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষয়িত্রী। গুলশান আখতার, আঞ্জুমান আরা, আয়েশা ফয়েজ ও নাসিমা বেগম। চারজনের নামের ইংরেজি আদ্যক্ষর দিয়ে

জ্ঞান (GAAN) কেন্দ্র। গুলশান ইংরেজি, আঞ্জুমান বাংলা, আয়েশা সমাজ এবং নাসিমা ম্যাম অঙ্ক পড়ান। তৃতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি শিক্ষার কোচিং সেন্টার এটি। জ্ঞান কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের ভীড় লেগেই থাকে। ১১ মাস জুড়েই এ অবস্থা। অভিভাবকরা এখানে পড়ান স্কুলে মেয়েদের বিশেষ সুবিধা পাবার জন্য। ম্যামরা ক্লাসে ছাত্রীদের বলেন জ্ঞান কেন্দ্রে কোচিং করলে স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে ভালো ফলাফল নিশ্চিত।

পৃথা ও তানহা ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। দুজনের বাসা মৌচাকের কাছে। তানহা তৃতীয় শ্রেণি থেকে এখানে কোচিং করছে। তানহার মায়ের পীড়াপীড়িতে পৃথার আম্মা মেয়েকে জ্ঞান কেন্দ্রে ভর্তি করিয়েছেন পঞ্চম শ্রেণি থেকে। পিএসসি পরীক্ষায় পৃথা জিপিএ ফাইভ পেয়েছে। কিন্তু ক্লাসে আগে ও ভালো নম্বর পেতো না। এখন সে সমস্যা নেই। প্রতি মাসে ৪ বিষয়ে কোচিংয়ের জন্য ৬ হাজার টাকা দিতে পৃথার আব্বার প্রাণান্তকর অবস্থা। কেননা, পিতা মতিঝিলে প্রাইভেট একটি ফার্মে সামান্য বেতনে চাকরি করেন। সীমিত বেতন। সংসারে টানাটানি।

জ্ঞান কেন্দ্রে ছাত্রীর সংখ্যা দেড় হাজারের ওপরে! সপ্তাহে দু-দিন ক্লাস। প্রতিটি ক্লাস ৪০ মিনিটের। দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত কোচিং। ৪ বিষয়ে পড়া বাধ্যতামূলক। তৃতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণির মাসিক বেতন ২ হাজার, পঞ্চম হতে অষ্টম শ্রেণির মাসিক বেতন ৩ হাজার টাকা। ভর্তির টাকা আলাদা। সকল স্তরেই ভর্তি ব্যয় ৫ হাজার টাকা। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে তা দিতে হয়। মাসে ৪ বিষয়ে পরীক্ষা জন্য ৫শ টাকা ছাড়াও মডেল টেস্ট, প্রশ্নপত্র অনুলিপির জন্য অভিভাবকদের আলাদাভাবে টাকা গুনতে হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে দুপুরে খাওয়াদাওয়া। এজন্য পৃথাকেও দিতে হয় ২শ টাকা!

এ মাসের বিরিয়ানিটা ফখরুদ্দিনের। পোলাওয়ের পরিমাণ বেশি। পৃথা না খেয়ে নিজের অংশটা আজও গরিবকে বিলিয়ে দেয়। স্কুলেও এমনটি করে পৃথা। শুধু কী তাই। আত্মীয়স্বজন ও পিতামাতার দেয়া টাকা সে জমিয়ে রাখে। টিফিন পিরিয়ডে সে টাকা দিয়ে সহপাঠিদের খাওয়ায়। কলম, পেনসিল, রাবার শার্পনার পারে তো নিজেরটাই দিয়ে দেয়। স্কুলে একবার অন্য শাখার এক শিক্ষার্থীর ক্যানসার আক্রান্ত মায়ের চিকিৎসার জন্য তহবিল সংগ্রহ করে পৃথা। ১৭ দিনে ও একাই টিফিন পিরিয়ডে অভিভাবক ও পথচারীদের কাছে ঘুরে ঘুরে ৪১ হাজার ৩৪৫ টাকা তোলে। সংগ্রহ করা টাকা গুলশান ম্যামকে দেয়। স্কুলের শিক্ষকরা পৃথাকে এজন্য বেশ বাহবা দেয়। জ্ঞান কেন্দ্রের সবাই তা জানে।

সুবিধা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা ও অভুক্ত থেকে অসহায় মানুষের প্রতি ভালোবাসার এ শিক্ষা কোথায় পেলো পৃথা? নাসিমা ও আয়েশা ম্যামকে বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে। ষষ্ঠ শ্রেণির এতোটুকুন মেয়ে যার কিনা প্রবল মানবতাবোধ!

বিরিয়ানির বাক্সগুলো পৃথা ও তানহা বাইরে ভিক্ষুকদের দিয়ে আসে। নাসিমা ও আয়েশা ম্যাম টিচার কক্ষে বসে আলাপ করছিলেন। বিকেল হয়ে এল। ঘরে ফেরার তাড়া সকলের।

নাসিমা ম্যাম আসিয়াকে ডেকে বললেন পৃথাকে ডাক তো?

পৃথাকে বসতে বললেন আয়েশা ম্যাম। বললেন,

-তুমি তো খাওনি বোধ হয়? আচ্ছা পৃথা তুমি না খেয়ে অপরকে তোমার খাবারটা দাও কেন? আগে তো নিজে খাবে ? উদ্বৃত্ত থাকলে তারপর অপরকে দিবে!

-আমরা তো খেতে পারি সব সময় ম্যাম! পথের গরিবরা তো অভুক্ত থাকে প্রায়ই। সমাজ পাঠে পড়েছি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই মানুষের ধর্ম! মণীষীরা ত্যাগ করেই মহামানব হয়েছেন।

পৃথার কথা শুনে শিক্ষকরা অবাক হয়ে যান! নাসিমা ম্যাম অন্য কক্ষে যান। আর আয়েশা ম্যাম রিভলভিং চেয়ারে আরামে শরীর হেলিয়ে দেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন। ডান হাতটা গালে রেখে টিচার কক্ষে জ্ঞান কেন্দ্রের একমাত্র শীতাতপ যন্ত্রটির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকেন!

-ম্যাম আসি? মাথা নাড়লেন ম্যাম। বাসায় ফেরার জন্য তানহাকে নিয়ে পৃথা কোচিং সেন্টার থেকে বেরিয়ে পড়ে। ■

শিশুসাহিত্যিক

হেমন্তের প্রকৃতি

তাসনুভা ফারিয়া

হেমন্ত আসে
কুয়াশার আবরণে,
শিশির ভেজা সকালে,
শিউলির ফুলে সুবাসে,
পাকা ধানের মৌ মৌ গন্ধে,
মটর ফুলের নাচের ছন্দে,
দোলা লাগে রাখালের সুরে,
পানিতে হাঁসেরা খেলা জুড়ে,
রাতের আকাশে চাঁদ হাসে,
রূপের ডানা মেলে।
পিঠা-পুলির আমেজে
খোকা-খুকু হাসে,
নবান্নের ঘ্রাণ ছড়িয়ে যায়
হেমন্তের বাতাসে।

দশম শ্রেণি,
নীলফামারি গভ. উচ্চ বিদ্যালয়
নীলফামারী

নতুন ধান

মাহমুদ হাসান

সবুজ-শ্যামল মায়া ভরা
মোদের পল্লিবালা
মেঠো পথে রূপের ছোঁয়া
হেমন্ত গাঁথা মালা।
আঁকা-বাঁকা পথ ধরে
গরু-মহিষের গাড়ি
আঁটি বেঁধে ধান নিয়ে
চলে গাঁয়ের বাড়ি।
সোনা রঙের ধানের সুবাস
মাঠ পেরিয়ে যায়
নতুন ধান পেয়ে কৃষকের
পরান জুড়ায়ে যায়।

মানিকগঞ্জ মডেল হাই স্কুল
মাস্টারপাড়া রোড, মানিকগঞ্জ

পিঠার থালা

রূপা আক্তার

আমডালে চড়ুই পাখি
তালগাছে কাক
জামের ডালে বসে
ঘুঘু পাখি দিচ্ছে ডাক।
মা গিয়েছে পুকুরেতে
উঠান ভরা ধান
খুকুর হাতে পিঠার থালা
ভেঙে করেছে খান খান।

৭ম শ্রেণি, বারহাট্টা উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা

● মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস ধারাবাহিক

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর একাদশ পর্ব-২য় অংশ]

বাবার কাণ্ড দেখে বিলু আপার বুক ভরে কান্না আসে। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বলে– আব্বা, আমি তোমার মেয়ে না? তুমি কষ্ট করে আমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছো। তুমি কোনোদিন কারও ক্ষতি করো না। সাধ্যমতো দান-খয়রাত করো। কখনও মিথ্যে কথা বলো না। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করো। সবাই তোমায় ভালো বলে। সেই ভালো-মানুষের মেয়ে হয়ে আমি চমৎকার আর জ্ঞানের কথা বলব না তো কী বলব? যাদের মন ভালো, তাদের কথাও সুন্দর, আবার কাজও ভালো হয়।

খালু কী বলবেন, ভেবে পান না। বিলু আপা বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে– আব্বা, রাতে ওই কাগজটা অবশ্য অবশ্যই ভালোভাবে পড়বা। কাল তোমার সাথে আরও অনেক জরুরি কথা হবে।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর খালু তবিবর মোল্লা শুনতে পান, রান্নাঘরে বিলু আপা কার সাথে যেন কথা বলছে নিচু স্বরে। তিনি সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন– মা বিলু, কার সাথে কথা বলছিস? বিলু আপা বেশ নিচু স্বরেই বলে– আব্বা, আমার বান্ধবী জেসমিন। ওর কথা তোমাকে এর আগে বলেছি।

জেসমিন আপা খালু তবিবর মোল্লাকে সালাম দেয়। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বলেন– ভালো আছো মা? তা রাতের বেলায় কী মনে করে? কার সাথে আসলে? দেশের যা অবস্থা–

বিলু আপা বাবার কথা কেড়ে নিয়ে চাপা গলায় বলে–আব্বা, সব কথা তোমাকে পরে বলছি। এখন শুধু এটুকু জেনে রাখো, এই জেসমিন, আমি এবং আমার আরও অনেক বান্ধবী– আমরা গোপনে দেশের জন্য কাজ করছি। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কাজ করছি।

মনে করো এ-ও এক ধরনের মুক্তিযুদ্ধ, আর আমরাও মুক্তিযোদ্ধা।

খালু তবিবর মোল্লার শিরদাঁড়া বেয়ে আতঙ্কের ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। এর আগে মেয়ের কাছ থেকে অনেক চমৎকার ও জ্ঞানের কথা শুনে তাঁর মনটা যতটুকু চাঙ্গা আর সাহসী হয়ে উঠেছিল, বিলু আপার এখনকার কথায় তা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তাঁর বুকটা কাঁপতে থাকে; তবে তা এই বিচ্ছুদের দুঃসাহস দেখে, না ভবিষ্যত বিপদের আশঙ্কায় তা বোঝা গেল না।

বাবার অবস্থা দেখে বিলু আপা বুঝতে পারে, তিনি ভয় পেয়েছেন। তাই আগের মতোই নিচু স্বরে বলে: আব্বা, ভয় পেয়ো না। তুমি ঘরে যাও। ওই প্রবন্ধটা পড়ো। আর শোনো, জেসমিন আজ আমাদের এখানে থাকবে। রাতে আমাদের অনেক কাজ আছে।

আর কোনো কথা না বলে কোনো রকমে নিজের ঘরে গিয়েই ধপাস করে খাটের ওপর শুয়ে পড়েন তবিবর মোল্লা। মনে তাঁর হাজারো চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। সে চিন্তার যেন কোনো লাগাম নেই, কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তাঁর মেয়ে আর তার বান্ধবীরা এই দুঃসময়ে দেশের কাজ করছে– বিলুর ভাষায় মুক্তিযুদ্ধ করছে, আর তিনি কিছুই করতে পারছেন না! বুড়ো হলে কি মানুষের আর কোনো মূল্য থাকে না! না, না, তা কেন হবে! ক্রমে ক্রমে তাঁর চিন্তার ঘূর্ণি-স্রোতের মধ্য থেকে ভয়ের কালো বুদ্বুদগুলো আস্তে আস্তে কোথায় যেন মিলিয়ে যেতে থাকে। তার বদলে সেখানে বাসা বাঁধতে থাকে সাহস, আত্মবিশ্বাস আর মন ভরিয়ে-দেওয়া গর্বের স্বাধীন প্রজাপতিগুলো!

তিনি খাটের ওপর উঠে বসেন। বিলু আপার দেওয়া সেই কাগজটা এখনো তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে। এই মুহূর্তে তাঁর মনে হতে থাকে, এ যেন কোনো কাগজ নয়; যেন এক বিরাট শক্তি, সাহস আর বিশ্বাসের আগুন। সে আগুন তাঁর মনের সমস্ত ভয়, জড়তা আর অজ্ঞতার জঞ্জাল যেন পুড়িয়ে নি:শেষ করে দিয়ে গেল!

'ইসলাম ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক হাতে-লেখা প্রবন্ধটি পকেট থেকে বের করেন তিনি। কী সুন্দর ঝকঝকে মুক্তোর মতো লেখা! মনটা জুড়িয়ে যায়। প্রবন্ধটা শুরু হয়েছে এভাবে:

'১৯৪৭ সালে ভারত ভেঙে পাকিস্তান হয়েছিল একটি মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে, তা হলো ইসলাম ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের আদর্শ। এ কারণেই বারো শ' মাইল ব্যবধানের মুসলিম-প্রধান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান। এত দূরের দুটি আলাদা ভূখণ্ড নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের নজির পৃথিবীতে আর নেই। একমাত্র ইসলামের অনুসারী অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার দোহাই দিয়েই তাদের জন্য এই অদ্ভুত রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হয়।

'কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমরা কী দেখলাম? আমরা দেখলাম ইসলাম আর মুসলিম ভ্রাতৃত্বের নামে চরম ধোঁকাবাজি, পদে পদে বঞ্চনা, শোষণ, নির্যাতন ও সর্বক্ষেত্রে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা। এর প্রথম নজির হিসেবে আমরা ভাষা-আন্দোলনের কথা বলতে পারি। শতকরা ৫৬ ভাগ অর্থাৎ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলাভাষী হলেও পাকিস্তানের জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নির্লজ্জের মতো ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ইসলামের ইনসাফ আর মুসলিম ভ্রাতৃ-চেতনার মূলে এটা ছিলো এক বিরাট আঘাত...'

খালু তবিবর মোল্লা যখন প্রবন্ধটির এ পর্যন্ত পড়েছেন, তখনই বিলু আপার গলা শোনা যায়– আব্বা, কী করছ? আসব?

–আয়। তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারবি না। আমি লেখাটা পড়া শুরু করেছি। ভারি চমৎকার এটি। তো, মা বিলু, মা জেসমিন, তোমরা তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও। আমি এখন খুব ব্যস্ত, তাই তোমাদের কাজের কথা এখন শুনতে পারছি না। কাল সকালে সব শুনব। তবে সব কথা না শুনেও আমার মনে হচ্ছে, তোমরা ভালো কাজ করছ। তাই আমিও তোমাদের সাথে আছি। আমি বুঝতে পারছি, আমরা ঠিক পথেই আছি।

বাবার কথায় খুবই খুশি হয় দুজন। জেসমিন আপা তো খুশির চোটে খালু তবিবর মোল্লার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। তিনি জেসমিন আপার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন। তারপর বলেন– তোমরা তোমাদের কাজে যাও মা। আমি লেখাটা শেষ করেই তবে শোবো।

মেয়েরা চলে যায়। খালুও ডুবে যান প্রবন্ধটিতে। তিনি একমনে পড়তে থাকেন। হঠাৎ একটি জায়গায় তাঁর চোখ আটকে যায়–আরে! মা বিলু তো ঠিক এমনটাই বলেছে! প্রবন্ধের ওই জায়গায় লেখা আছে–

'হানাদার বাহিনী আর তাদের দোসররা প্রচার করছে, মুক্তিযোদ্ধারা মুসলমান নয়, তারা বিদেশি দালাল। তারা পাকিস্তান ভাঙার জন্য মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে কুফরি কাজ করেছে। এজন্য তারা এখন আর মুসলমান নেই। আর যেহেতু তারা মুসলমান নয়, তাই তাদের হত্যা করা, তাদের মালামাল লুট করা জায়েজ। তাদের এসব মাল-সম্পদ গনিমতের মাল হিসেবে গণ্য হবে– যা ভোগ করবে পাকিস্তানি আর্মিরা এবং তাদের সহযোগী রাজাকার-আলবদরের সদস্যরা। এ বিষয়ে বিকৃত ফতোয়া দিয়ে তারা একটা বুকলেটও বের করেছে। এই বুকলেট রাজাকারদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে এবং ওদের অন্য সহযোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। আর এর ফলস্বরূপ সন্দেহভাজনদের ধরে ধরে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, তাদের বাড়িতে চলছে অগ্নিসংযোগ, মালামাল লুট। এমন কি নারীর সম্ভ্রমহানির মতো জঘন্য পাপ করতেও তারা পিছপা হচ্ছে না।

'কিন্তু ইসলামের ইতিহাস এ বিষয়ে কী বলে? অবিশ্বাসীদের সাথে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর কঠোর নির্দেশ থকতো নারী, শিশু, বৃদ্ধদের প্রতি কোনোরকম আঘাত না করতে। এমন কী ফসলের খেত এবং ফলবান বৃক্ষেরও কোনো ক্ষতি না করার নির্দেশ থাকতো। এ ছাড়া, তাঁর নির্দেশ থাকতো যুদ্ধ ছাড়া শত্রুর ওপর হামলা না করার জন্য। আর গনিমতের মাল? সম্মুখযুদ্ধে বিজিত বাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া মালামালই হলো গনিমতের মাল; তস্করের মতো নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের বাড়ি থেকে লুট করে আনা মালামাল, গরু-ছাগল ইত্যাদি কখনই গনিমতের মাল নয়– স্রেফ হারাম! শতভাগ অবৈধ! আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো: ইসলামের কোনো যুদ্ধেই মুসলমানেরা আগে আক্রমণ করেননি। কিন্তু হানাদার বাহিনী অন্যায়ভাবে বাঙালিদের ওপর আগে আক্রমণ করে প্রিয় নবী (সা.)-এর সুন্নতের বিরোধী কাজ করেছে।

'অথচ দেখুন, হানাদার পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের এ-দেশীয় দালালেরা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কীভাবে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করছে আর নিজেদের স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টা করছে! এর ফলে একদিকে দেশটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে; অন্যদিকে পবিত্র শান্তির ধর্ম ইসলামের ওপরও কালিমা লেপন করছে তারা। তাই ইসলাম প্রিয় ভাই-বোনদের প্রতি আমার অনুরোধ: আসুন আমরা সবাই এই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।'

তবিবর মোল্লা প্রবন্ধ পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন। এ কী হচ্ছে দেশে! ধর্মের নামে এতবড়ো জুয়োচুরি! এই গুনাহর আগুনে ওরা একদিন পুড়ে মরবেই।

বিলু আপা নিজের ঘরে জেসমিনের সাথে আলোচনায় বসেছে। বিলু আপা বলে– আমার খালাতো ভাই মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বাবু খবর পাঠিয়েছে, আমাদের এখানকার রাজাকার ক্যাম্প রেইড হবে খুব তাড়াতাড়ি। এজন্য পাঁচটি নিরাপদ বাড়ি সিলেক্ট করতে হবে। এসব বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর রেকি-দলের পাঁচ সদস্য অবস্থান করে পুরো এলাকা রেকি করবে, ক্যাম্পের অবস্থান পর্যবেক্ষণ ও এর ম্যাপ তৈরি করবে। রাজাকারদের মুভমেন্ট লক্ষ্য করবে। সব কাজ শেষে আক্রমণের প্ল্যান ফাইনাল করবে। এজন্য এসব বাড়িতে ওদের দিন-দুয়েক থাকতে হতে পারে। বাবু এজন্য আমাদের ছাত্রী ব্রিগেডের সাহায্য চেয়েছে।

জেসমিন বলে– অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। শোন, ব্রিগেডে আমরা যে দশজন মেয়ে আছি, তাদের মধ্যে যে পাঁচজনের বাড়ি সুবিধাজনক পজিশনে ও একটু নিরিবিলি পরিবেশে সে-সব বাড়িতেই রেকি-দলের ভাইয়েরা থাকবেন। কাল ওই মেয়েদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ভেবেচিন্তে বাড়িগুলো সিলেক্ট করতে হবে, তারপর বাবু ভাইকে সময়মতো জানাতে হবে। কী বলিস বিলু?

বিলু আপা বলে– ঠিক বলেছিস। তবে সবাইকে একসাথে ডেকে আলোচনা করা যাবে না। এতে কেউ সন্দেহ করতে পারে। তাই কাল আমাদের দুই

ইনফরমারের মাধ্যমে ব্রিগেডের অন্য চার জনের কাছে কমান্ডার বাবুর খবরটা পৌঁছাতে হবে– যাদের বাড়ি ক্যাম্পের মোটামুটি কাছাকাছি আবার নিরিবিলি পরিবেশে। আমার তো মনে হয় আমিনা, ফাতেমা, রোকেয়া, শাহানারা এবং আমাদের বাড়ি– এই পাঁচটি বাড়িই সবচেয়ে সুবিধাজনক পজিশনে রয়েছে।

রেকি-দলের ভাইয়েরা আত্মীয় পরিচয়ে থাকবে, মাত্র তো দুটো দিন। কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, সবাইকে আমাদের বাড়িতে একসাথে আসার দরকার নেই। প্রথম পর্যায়ে দুজন আসবে অঙ্ক বা ইংরেজি হাতে নিয়ে। তোরা তো জানিস, তোদের মধ্যে বরাবর আমার রেজাল্টই সবচেয়ে ভালো। পথে কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করে তো ওরা বলবে–মেধাবী ছাত্রী ও প্রিয় বান্ধবী বিলকিসের কাছে যাচ্ছে অঙ্ক বা ইংরেজি বুঝতে। অন্য আরেক সময়ে আসবে বাকি দুজন। তারাও একই কৌশল অবলম্বন করবে।

বিষয়টা নিয়ে আব্বার সাথে আজ রাতেই আলাপ করতে হবে। এ কাজে তার সাহায্য লাগবে। এখন তার মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন দেখছি, তাতে তিনি আর ভয় পাবেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া তার পাকিস্তান রক্ষার মোহটাও পুরোপুরি কেটে গেছে। করিম মুন্সির ইসলাম-ব্যাখ্যা যে আসলে অপব্যাখ্যা, আমার মনে হয় আব্বা তা ভালোভাবে ধরে ফেলেছেন। ওই প্রবন্ধটি পড়া শেষ হলে তিনি আরও ভালোভাবে বুঝবেন। যা হোক, আব্বাকে দিয়ে কাল ভোরেই ইনফরমারদের খবর দেবো। ওরা তো আবার ল্যাংড়া ভিক্ষুক। কেউ ওদের সন্দেহ করবে না। বড়ো খাঁটি জিনিস! এ পর্যন্ত ওরা বিন্দু পরিমাণ ভুলও করেনি কোনো কাজে। আর হ্যাঁ, ওরা কার সিলেকশন দেখতে হবে না! এই বিলকিস আক্তার বিলু আর তার প্রিয় বান্ধবী জেসমিন রহমানের চয়েস কী কখনও ভুল হতে পারে!– বলেই মিষ্টি করে হাসে বিলু আপা। জেসমিন আপাও হাসে।

খালু তবিবর মোল্লার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। বিলু আপা আর জেসমিন আপা এগিয়ে যায় সেদিকে। দরজায় আস্তে টোকা দিয়ে বিলু আপা বলে–আব্বা ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি? একটা জরুরি কথা ছিল।

বিলুর ডাক শুনে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে তবিবর মোল্লা বলেন–আয় মা আয়। ঘুমাইনি। ঘুম আসছে না।

বিলু আপারা ঘরে ঢোকে। জেসমিন আপা দরজাটা লাগিয়ে দেয়। বাড়িতে আর কেউ নেই। এত রাতে আর কারো আসার সম্ভাবনা না থাকলেও সাবধানের মার নেই, তাই এই সতর্কতা।

ওরা কেন এসেছে– বিলু আপা এ বিষয়ে মুখ খোলার আগেই খালু তবিবর মোল্লা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলেন– ওই লেখাটা আমার পড়া শেষ। একদম ভাজা ভাজা করে ফেলেছি। মা রে, অনেক জ্ঞানের কথা আছে ওতে। আমার চোখ একেবারে খুলে গেছে যেন! তোর লেকচার শুনে আর মওলানা সাহেবের লেখাটা পড়ে আমি পাকিদের সব ফাঁকি ধরে ফেলেছি। আমি এসব এখন সুযোগমতো অন্যদেরও বুঝাবো। আর তোরা তো বুঝাবিই।

বাবার খুশি দেখে বিলু আপাও ভারি খুশি হয়। বাবা যে প্রবন্ধটা ভালোভাবে পড়েছেন এবং এর বক্তব্য পছন্দ করেছেন, এটা খুবই আশার কথা। আসলে এটা ছিল পরীক্ষামূলক একটা উদ্যোগ। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কতটা যুক্তিযুক্ত এবং সাধারণ

মানুষ তা কীভাবে গ্রহণ করে, সেটা পরীক্ষা করার জন্যই বিলু আপা তার বাবাকে ওটা পড়তে দিয়েছিল। সেই পরীক্ষা সফল হয়েছে দেখে সে খুবই খুশি হয়। তারপর বলে– অবশ্যই সকলকে বোঝাবো আব্বা। আমার অন্য বন্ধু ও বান্ধবীরাও যার যার সুবিধেমতো এ কাজ করবে। এভাবে বোঝানোটা খুবই জরুরি। সাধারণ মানুষ ধর্মকে সম্মান করে। এই সুযোগটাই নিচ্ছে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের মুরুব্বিরা। ধর্মের অপব্যাখ্যা করে তারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে; মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামবিরোধী বলে অপপ্রচার করছে। এ কারণেই এই পথ বেছে নেওয়া। এ ব্যাপারে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারলে পাকিদের সব বদমতলব ভেস্তে যাবে। তখন মানুষ আর তাদের মিথ্যে প্রচারণায় ভুলবে না।

এরপর বিলু আপা খালুকে বলে– আব্বা, একটা নতুন কথা বলার জন্য তোমার কাছে এসেছি। খুবই জরুরি কথা।

আবার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে তবিবর মোল্লার। মেয়েটা আবার কী বলবে, কে জানে! এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তিনি মেয়ের দিকে তাকান। তাঁর ঘরের পেছন দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে ঘন কলাগাছের বাগান। বেড়া দেওয়া। পুব ও পশ্চিম দিকে আম-কাঁঠালের কয়েকটা বড়ো গাছ। দক্ষিণ দিকে উঠান। উঠান পেরিয়ে পুকুর। বাড়ির মধ্যে খুবই নির্জন এই ঘরটা। তবুও নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করেন– মা বিলু, তোর নতুন আর জরুরি কথাটা কী? শোনার জন্য মন বড়ো অস্থির হয়ে উঠেছে।

বিলু আপা জেসমিন আপাকে বলে–জেসমিন, তুই সব খুলে বল আব্বাকে।

জেসমিন আমাদের রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা, রেকি দলের পাঁচ সদস্যকে খুব সাবধানে পাঁচটি বাড়িতে রাখা, এ বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁদের বাড়িতে ছাত্রী ব্রিগেডের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক এবং আগামীকাল ভোরে দুই ইনফরমারকে খবর দেওয়া ইত্যাদি সব কথা খুলে বলে।

তবিবর মোল্লা সব শুনে বললেন– মনে হচ্ছে আমরা এবার সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা হতে যাচ্ছি। আমি কাল ভোরেই বলদেঘাটার বটতলায় যাব। গুপ্তচরেরা তো রাতে ওখানেই থাকে। দিনে মানুষের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে। রাজাকার ক্যাম্পের আশেপাশেও ভিক্ষে করতে দেখেছি ওদের। কিন্তু ওরা যে দেশের জন্য এত বড়ো কাজ করছে, ল্যাংড়া-খোঁড়া হয়েও যে ওরা বিরাট বড়ো মুক্তিযোদ্ধা, তা তো জানতাম না! মা রে, তোদের কাণ্ড দেখে আমি একেবারে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি। কোনো চিন্তা করিসনে। আমাকে সবসময় তোদের পাশে পাবি। তো, এখন মনে হয় আর কোনো কথা না। রাত অনেক হয়ে গেছে। তোরা শুতে যা। ওই লেখার বিষয়ে সকালে কথা হবে– তোদের গুপ্তচরদের খবর দিয়ে আসার পর। তবে বেশি কথার দরকার হবে না। আমি ভালো করেই ওটা পড়েছি। সব কথাই আমার মনে গেঁথে রয়েছে। সেইসাথে আমার সব ভুল ধারণাগুলোও দূর হয়ে গেছে। হায় হায় রে! পাপী বদমাশগুলো সাধারণ মানুষদের কী ভুলই না বুঝাচ্ছে! মানুষের কী সর্বনাশটাই-না করছে!

পরদিন ফজরের নামাজ পড়েই খালু তবিবর মোল্লা বলদেঘাটার বটতলায় গিয়ে ভিক্ষুক বেশি ল্যাংড়া ইনফরমার দুজনকে বিলু আপাদের খবর দিয়ে আসেন। তখনও বেশ অন্ধকার থাকায় পথে কারও সাথে তার দেখা হলো না। একেবারে গেরিলা বিচ্ছুর মতো পাকা কাজ!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যাংড়া ভিক্ষুক দুজনের এক জন এল বিলু আপাদের বাড়িতে। এসেই, আপা খয়রাত দেবেন! ন্যাংড়া-খোঁড়া কপাল পোড়া এক গরিব মিসকিন। চারডে খয়রাত দেন গো আপা– বলে বিলু আপার দিকে তার দুমড়ানো থালাটি বাড়িয়ে দেয়। আশপাশে বাইরের কেউ না থাকলেও বিলু আপার সতর্কতার কমতি নেই। সে একটা বাটিতে বেশকিছু চাল নিয়ে ভিক্ষুকের গামলায় ঢেলে দিলো। এ সময় সে চালের সাথে একটা (অথবা একাধিক) ছোট্ট চিরকুট এমন দক্ষতায় ভিক্ষুকের গামলায় চালান করে দিলো যে, ওর বাবা কিংবা জেসমিন আপা কেউই কিছু বুঝতে পারল না।

চিরকুট দেখেই ওটা গামলার চালের নিচে ঢেকে দিয়ে আর কিছু না বলেই ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলে যায় ভিক্ষুক। বিলু আপা তবিবর খালু আর জেসমিন আপাকে ইশারায় বোঝায় যে, সব ঠিকমতো হয়েছে।

তবিবর মোল্লার তো চোখ কপালে উঠে যাওয়ার যোগাড়। জেসমিন আপাও কম অবাক হয়নি বিলু আপার এত নিখুঁত হাতসাফাই দেখে। বিলু আপা ওদের ঘরে ডেকে নিয়ে সব বুঝিয়ে দেয়। বলে–আসলে চিরকুট ছিল দুটো। ওরা দুজন না? কিন্তু এল তো একজন। এটা সাবধানতার জন্য। দুজন একসাথে এক বাড়িতে ভিক্ষে করতে এলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। এটা ওদের আগেই ট্রেনিং দেওয়া আছে। ওই ছেলেটা অন্য চিরকুটটা অন্য ইনফরমারের কাছে দেবে। ওরা দুজন ভাগাভাগি করে চারটি বাড়িতে খবর পৌঁছে দেবে, তারপর চিরকুট ছিঁড়ে ফেলবে। কোনো দৃশ্যমান আলামতই কারো কাছে থাকবে না। প্ল্যান ঠিক আছে না?

–এক্সিলেন্ট !–জেসমিন আপার অকপট প্রশংসা।

তবিবর খালু কী বলবে ভেবে না পেয়ে বিলু আপার দিকে তাকিয়ে কেবল হাসতে থাকেন।

দুপুরের আগেই দেখা গেল– বড়ো সাইজের বই হাতে নিয়ে দুটি মেয়ে এল বিলু আপাদের বাড়ি। ঘণ্টাখানেক পরে আবার চলেও গেল। আসলে ওরা ছাত্রী ব্রিগেডের দুই সদস্য– আমিনা আর ফাতেমা। পরদিন সকালে এল রোকেয়া আর শাহানারা। ওরাও মেধাবী বিলকিসের কাছে 'ইংরেজি, বীজগণিত আর জ্যামিতির কিছু জটিল বিষয় বুঝতে এসেছে'! ঘণ্টাখানেক পরেই চলে গেল ওরাও। আর জেসমিন আপা তো আরও দু-এক দিন থাকবে তার বান্ধবীর বাড়ি। ও না কি ইংরেজি, পাটিগণিত, বীজগণিত আর জ্যামিতি এই চার সাবজেক্টেই বড্ড কাঁচা। তাই বিলুর কাছে 'ওইসব বিষয়ে একটু ভালো করে তালিম নিচ্ছে'!

এর পরের ঘটনা বিশাল, কিন্তু ঘটল খুব দ্রুত। ছাত্রী ব্রিগেডের সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর রেকি দল নিরাপদে রাজাকার ক্যাম্প ও তার আশপাশ নিখুঁতভাবে রেকি করে গেল। এ ব্যাপারে ছাত্রীদের বাড়ির সবার সহযোগিতা মনে রাখার মতো। আর আমার খালু তবিবর মোল্লার কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। তিনি তো এখন ছাত্রী ব্রিগেডের ছায়াসঙ্গী, নিত্য সহচর!

তো, রেকি হয়ে যাওয়ার চার দিনের মাথায় এক গভীর রাতে আক্রান্ত হলো রতনপুর রাজাকার ক্যাম্প। এ

আনিশা চৌধুরী, ২য় শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

পর্যন্ত এ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো সরাসরি হামলা হয়নি বলে রাজাকারেরা বহালতবিয়তেই ছিল। আমাদের রেকিতে ওদের এই ঢিলেঢালা অবস্থার তথ্য ছিল। সেই সুযোগটাই গ্রহণ করি আমরা এবং ওদের পরাজিত করি। আমার কমান্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের নিখুঁত প্ল্যান, নির্ভুল আক্রমণ। চাইনিজ রাইফেল, এলএমজি আর গ্রেনেডের সাঁড়াশি আক্রমণে অধিকাংশ রাজাকারই খতম হলো ঘুমের মধ্যেই। ক্যাম্পের বারান্দায় গ্রেনেড হামলায় মারা গেল 'সাচ্চা পাকিস্তানি' রাজাকার-কাম প্রচারক করিম মুন্সি। যারা পাহারায় ছিল, তারাও কিছু বুঝে ওঠার আগেই চারদিক থেকে ছুটে আসা গুলি আর গ্রেনেডের আঘাতে অক্কা পেল। কেউ কেউ গুরুতর আহত হলো। কেউ কেউ জান নিয়ে পালিয়ে বাঁচল। রাজাকার বাহিনী পালটা আক্রমণের সুযোগও পেলো না। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কেউ হতাহত হয়নি, শুধু আমার বন্ধু সাইদের ডান হাতে কীসের যেন একটু খোঁচা লেগেছে– বোঝা যাচ্ছে না। সামান্য ফুলে উঠেছে। এখনই তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে।

এদিকে ইনফরমারের মাধ্যমে ছাত্রী ব্রিগেডকে থ্যাংকস জানালাম আমি। খালু তবিবর মোল্লাকেও অভিনন্দন জানালাম। ইচ্ছে ছিল খালুদের বাড়িতে যাওয়ার, কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে আমি আমার রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী নিয়ে বিল জলেশ্বর হয়ে সুঁড়োর দিকে চলে গেলাম ভোররাতের মধ্যেই। জমির ভাইয়ের বাহিনীও চলে গেল ধলগ্রামের দিকে। তিনি এখন অসুস্থ বলে তার বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার সানোয়ার ভাইকে অস্থায়ী কমান্ডার হিসেবে ঘোষণা করলাম। সানোয়ার ভাই খুশিমনে সে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

বিলু আপা, জেসমিন আপা আর খালু তবিবর মোল্লার সারাটা রাত কেটেছে না-ঘুমিয়ে। ইনফরমারদের মাধ্যমে ক্যাম্প আক্রমণের খবর তারা পেয়েছিল। কিন্তু বিস্তারিত না জানতে পেরে ভারি টেনশন হচ্ছিল। শেষে বিজয়ের খবর পাওয়ার পর ওদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। সেই স্বস্তির সাথে যে খুশির ঢেউ তাদের মনে উথাল-পাথাল করে, তার খবর কেউ পেল না। এরই মধ্যে আমার পাঠানো অভিনন্দন-বার্তা পেয়ে তাদের আনন্দ শতগুণ বেড়ে গেল।

বাকি রাত ওরা কেউ আর ঘুমায় না। আজকের সকালের নতুন সূর্যের প্রথম হাসিটা ওরা নিজের চোখে দেখবে বলে তিনজনই বাইরে আসে। চারদিক ফরসা হয়ে আসছে। বড়ো মিষ্টি নতুন একটা সকাল। আজকের সকালটা তাদের কাছে একেবারে অন্যরকম লাগছে– যেন এই আবছা অন্ধকার ভেদ করে শত শত সূর্যের সোনালি রশ্মি তাঁদের খুশির বন্যায় ভাসিয়ে দিতে আসছে! ■ *[চলবে...]*

শিশুসাহিত্যিক

তর্জনীর ফসল

শাহ্ আবুল খায়ের

আমার প্রাণের কথা কেউ বলেনি
বলেছো নেতা তুমি,
তোমাকে চিনেছি ক্ষণে ক্ষণে
সূর্য শিখা তুমি।

১৭ই মার্চে গোপালগঞ্জে জেগেছিল যে রবি,
কে জানতো সেই ছোট্ট খোকা
আঁকবে নতুন মানচিত্রের ছবি।

অসুরেরা সেই অরুণ রবি গ্রাস করতে চায়
বুঝল না তারা, এই সূর্য ম্লান হবার নয়
সেই সূর্য একদিন তাঁর জাগালো তর্জনী
বুকে হাত দিয়ে বলল সবাই বাংলা আমরা জানি।

তাঁর ডাকে সাড়া দিলো
বাঙালি আর সাঁওতাল, কোল, গারো
অস্ত্র হাতে বলল সবাই সোনার বাংলা ছাড়ো।
সেদিন থেকে অসুরেরা পালালো অবশেষে
শূন্যে নতুন পতাকা উড়ল পৃথিবীর ইতিহাসে।

শিখতে শিখি সহজে

কাজী নুসরাত সুলতানা

কত যে পড়া পড়তে হয়, কত যে পড়া শিখতে হয়, তার আর শেষ নেই যেন! পড়তে পড়তে আর শিখতে শিখতে একেবারে কাহিল অবস্থা হয়ে যায়! তোমারও কি এ রকম হয় কখনো? আমার তো খুব হয়। সেই যে স্কুলে প্রথম ভর্তি হওয়া, তারপর থেকে বইভর্তি ব্যাগ পিঠে নিয়ে যাওয়া-আসা, পড়া মুখস্থ করা, পরীক্ষার খাতায় ঠিকঠাক মতো লিখে আসা ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য! চলছে তো চলছেই এসব, তাই না? অনেক অনেক প্রশ্ন, অনেক অনেক উত্তর, সময় তো লাগবেই; আর বড়ো বড়ো উত্তর যখন শিখতে হয় তখন তো প্রায় সারাটা দিনই লেগে যায়। কোনো শখের কাজ যেমন– মাঠে খেলতে যাওয়া, গল্পের বই পড়া, ছবি আঁকা বা গান করা কোনো কিছুরই সময় পাওয়া যায় না। অথচ ওই ধরনের কিছু একটা, দিনের মধ্যে অন্তত খানিকটা সময় করতে না পারলে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। তোমারও হয় নিশ্চয়ই। আসলে সব ছেলে-মেয়েরই, তা সে ছোটো হোক বা বড়ো হোক খেলতে না পারলে বা শখের কোনো কাজ করতে না পারলে মন খারাপ হয়ে যায়। বড়োরা যে সেটা বোঝেন না তা নয়। কিন্তু কী করবেন আর! পড়া মুখস্থ করা ছাড়া অন্য কিছু করতে দিতে সাহসই পান না! কারণ ভালো করে মুখস্থ করে না শিখলে তো পরীক্ষার খাতায় ভালো করে লেখা যাবে না। আর ভালো করে না লিখলে তো ভালো নম্বর পাওয়া যাবে না। ভালো ফল করার জন্য তো সেটাই জরুরি। তাই আর কী করা। মা-বাবা, শিক্ষক সবাই বলেন, 'ভালো করে পড়ো, ভালো করে মুখস্থ করো, পরীক্ষার খাতায় ভালো করে লেখো; অন্য কোনো দিকে মন দিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই'।

কিন্তু আমার যে মন মানে না! শখের কাজের একটা-

দুটোও অন্তত করতে না পারলে আমার যে মনে হয় দিনটাই বৃথা গেল! অথচ পরীক্ষায় খারাপ করাও তো চলবে না। শুধু মা-বাবার জন্য নয়; নিজের সম্মানের জন্যও পরীক্ষায় ভালো করাটা জরুরি। তারপর কি হলো জানো? সময় বাঁচিয়ে সহজে শিখে ফেলার কিছু কৌশল সম্পর্কে আমি জানতে পেরে গেলাম! আমার বাবাই অবশ্য সেগুলো জানার সুযোগ করে দিলেন। ওই কৌশলগুলো ব্যবহার করে আমি কম সময়ে পড়া শিখে ফেলতে পারছি, সময় বাঁচাতে পারছি আর আমার শখের কাজের চর্চাও করতে পারছি। আমার শখের কাজের মধ্যে রয়েছে গল্পের বই পড়া আর গান করা। এছাড়াও অন্য একটা ব্যাপার আছে। আমার নতুন নতুন অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে, শিখতে ইচ্ছে করে। নতুন কিছু শেখাটা আমার কাছে চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা। একটা নতুন কিছু শিখলে বা জানলে আমার মনে হয় আমি নিজেই নিজেকে একটা খুব ভালো উপহার দিলাম। আমার জানতে ইচ্ছে করে নানান দেশের কথা, নানান মানুষের কথা, সুন্দর সুন্দর জায়গার কথা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা, গাছপালা-ফুল-পাখির কথা। এসব জানতে-শিখতে হলে তো পড়তে হয়। আর পড়তে তো সময় দরকার! স্কুলের পড়া করতে করতেই যদি দিনের সবটা সময় চলে যায় তাহলে ওই সব বিষয় নিয়ে পড়ব কখন? তাই অল্প সময়ে বেশি পড়া আর ঠিকমতো শেখার কৌশলগুলো ব্যবহার করছি আমি। ফলও পাচ্ছি সেইমতো। ও আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি। মাঠে খেলার ইচ্ছেটা আমি স্কুলের টিফিনের ঘণ্টাতেই পূরণ করতে পারি। কারণ আমাদের স্কুলে বেশ বড়োসড়ো একটা মাঠ রয়েছে। এটা আমাদের বিরাট সৌভাগ্য। কারণ শহরগুলোর, বিশেষ করে ঢাকা- শহরের অনেক স্কুলেই মাঠ নেই। ভাবলেই কেমন যেন কষ্ট লাগে আমার! ওইসব স্কুলের বন্ধুদের দৌড়াদৌড়ি করে খেলবার সুযোগ নেই! সে যাক, কী আর করা। এ ব্যাপারে তো আমার কিছু করার নেই। আমি বরং এখন সেই কৌশলগুলোর কথা বলি যেগুলো কাজে লাগিয়ে অল্প সময়ে পড়া শিখে নিতে পারছি। আসলেই অনেকখানি লেখা নিয়ে তৈরি এক একটা উত্তর মনে রাখা বেশ কষ্টের আর অনেকটা সময়ের ব্যাপার। সেই কষ্ট আর সময় বাঁচানোরই কৌশল এগুলো:

১. **পড়া শেখার ইচ্ছে নিয়ে পড়তে বসা:** প্রথমেই আমি যেটা করি সেটা হলো খুশি খুশি আর শান্ত মন নিয়ে পড়তে বসি আর মনে মনে বলি আজকে যে পড়াগুলো শিখতে হবে সেগুলো আমি শিখে ফেলব ইনশাআল্লাহ!

২. **সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া:** তারপর যেটা করি সেটা হলো অন্য সবকিছু থেকে মনোযোগ সরিয়ে যেটা শিখতে হবে সেটাতে পুরো মনোযোগ দেই।

৩. **অর্থ বুঝে পড়া:** কোনো কবিতা, কোনো প্রশ্নের উত্তর, এ ধরনের বিষয় যখন শিখতে বা মুখস্থ করতে হয় তখন সেগুলোর অর্থ ভালো করে বুঝে নিয়ে তারপর মুখস্থ করার চেষ্টাটা শুরু করি।

৪. **'সম্পূর্ণ-অংশ' পদ্ধতি প্রয়োগ করা:** যে বিষয়টা পড়তে হবে প্রথমে সেটা আমি পুরোটা বা সম্পূর্ণটা একবার বা দু'বার পড়ে নেই। যেমন ধরো কোনো গল্প বা কবিতা অথবা আমার বিশ্ব পরিচয়ের অধ্যায় ১-এর 'প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ' অংশটা গল্পের মতো করে পুরোটা পড়ে ফেলি। বিষয়টা কী নিয়ে বা এই অংশটুকুতে কি বলা হয়েছে সেটা বোঝা হয়ে গেলে কবিতার চারটা বা আটটা করে লাইন নিয়ে বা গল্পের অনুশীলনীর এক একটা প্রশ্নের উত্তর অথবা অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ১, ২ করে যে ভাগগুলো আছে সেগুলোকে শিখি এক এক করে। এই শেখার জন্যেও ভাগগুলোতে বা অংশতে যে কথাগুলো আছে সেগুলোও একটা একটা করে বুঝে নিয়ে তারপর একটা একটা করে মুখস্থ করি। আমি দেখেছি এভাবে করে পড়লে মনে রাখতে অনেক সুবিধা হয়।

৫. **নিজের মতো করে লেখা:** সম্পূর্ণ থেকে নিয়ে ছোটো একটা অংশ যখন মনে হয় বুঝেছি আর শিখেছি তখন সেটাকে নিজের মতো করে লিখে ফেলি। পরে বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখি ভুল হলো কিনা, বাদ গেল কিনা। দরকার পড়লে আবার পড়ি, আবার শিখি, আবার লিখি। তবে একেবারে যে বইয়ের মতো করে লিখতে চেষ্টা করি তা নয়। মূল কথা বা ধারণা ঠিক রেখে নিজের ভাষায় লিখি। এতে করে মনে থাকে বেশিদিন।

৬. **আবৃত্তি করা:** কোনো কবিতা মুখস্থ করতে হলে ছন্দ ঠিক রেখে, অর্থ বুঝে আবেগ দিয়ে বার বার আবৃত্তি করি। এতে করে মুখস্থ হয় বেশ তাড়াতাড়ি।

৭. **সবিরতি পড়া বা অনুশীলন করা:** কোনো একটা পাঠ শিখতে গিয়ে, যেমন কোনো প্রশ্নের উত্তর শেখা বা কোনো কবিতা মুখস্থ করা, সেটা আমি একবারে করি না। কয়েকবার পড়ে সেটাকে সরিয়ে রেখে অন্য কিছু পড়ি বা অন্য কোনো কাজ করি। কয়েক ঘণ্টা পরে বা পরের দিন আবার আগের পড়াটা পড়ি। বড়োরা বলেছেন এভাবে পড়লে শিখতে সময় কম লাগে। কারণ প্রথমবারের পড়াটা খানিকটা সময় পার হয়ে যাওয়ার পর কিছুটা হলেও স্মৃতিতে বা মগজে বসে যায়। আর পরের বারের পাঠ আগের বারের স্মৃতিতে জমে থাকা পাঠকে জাগিয়ে তুলে বলে শিখতে সময় কম লাগে। আমিও তাই দেখেছি। তাছাড়া একবার বসে অনেকবার টানা অনুশীলন করলে একটা ক্লান্তি আসে; মনে হয় মাথায় কিছু ঢুকছে না, মনোযোগ থাকছে না। একটা বিরতি দিয়ে বা অন্য কোনো কাজ করে ফিরে এলে নতুন উদ্যমে অনুশীলন শুরু করা যায়। এভাবে পড়াকে বণ্টিত অনুশীলনও বলা হয়।

৮. **জোরে জোরে পড়া:** আমি সাধারণত: মনে মনে পড়তে পছন্দ করি। কিন্তু অনেক সময় আবার জোরে জোরে প্রত্যেকটা শব্দ সুন্দরভাবে উচ্চারণ করে মুখস্থ করার চেষ্টা করি। এটা যে কেবল কবিতার বেলায় করি তা নয়। গদ্য উত্তরের বেলাতেও করে থাকি। এতে সুবিধাটা হয় এই যে এতে করে পড়াটা দু'ভাবে মাথায় ঢোকে; দেখছি বলে চোখ দিয়ে আর জোরে শব্দ করে উচ্চারণ করছি বলে কান দিয়েও। তাছাড়া পড়তে পড়তে অনেক সময় ঝিমুনি আসে; সেটাও কেটে যায়। অবশ্য লিখে শেখার বেলাতেও এই রকম দুটো ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়; চোখ আর হাত! আসলে বড়োরাই বলে থাকেন যে একের বেশি ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে কোনো কিছু শিখলে তাড়াতাড়ি শেখা হয়।

অনেকগুলো কৌশলের কথা বলে ফেললাম। সবগুলো একসাথে ব্যবহার করা যায় না; দরকারও পড়ে না। যখন যেমন তখন তেমন! তার মানে পাঠের ধরণ বা সময় অনুযায়ী দুই, তিন বা চারটে কৌশল ব্যবহার করে কম সময়ে পড়া শিখে নিতে পারা যায়। আমার বেশ কাজে লাগছে কৌশলগুলো। তুমিও চেষ্টা করে দেখতে পারো। ■

প্রফেসর ও প্রাবন্ধিক

সুমাইয়া কামাল, ১০ম শ্রেণি, কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টিকাটুলি

ডেঙ্গু প্রতিরোধে চাই সচেতনতা

হাছিনা আক্তার

এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশও এখন একটি ডেঙ্গুপ্রবণ দেশ। প্রতি বছরই দেশে এখন ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। জুনের মাঝামাঝি থেকে আগস্ট পর্যন্ত বর্ষার সময়ে প্রায়ই থেমে থেমে বৃষ্টি হয়। এতে বাড়ির আশপাশে, ছাদের টবে, চৌবাচ্চায় পানি জমে। এসব জমে থাকা পানিতে জন্মায় ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু বহনকারী এডিস মশা। সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এডিস মশার বিস্তার অনেক বেশি থাকায় এ সময়টাকে ডেঙ্গুর মৌসুম বলা হয়। তবে এবার অক্টোবরে দেশের কোথাও কোথাও সেপ্টেম্বরের

তুলনায় তিনগুণ নতুন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে। চিকিৎসকরা এ বছর অসময়ের বৃষ্টিকে এর অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন। ডেঙ্গু আক্রান্তদের অনেকের মধ্যে বর্তমানে ডায়রিয়া ও কাশির মতো উপসর্গও দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি রক্তের অনুচক্রিকা খুব দ্রুত কমছে এবং তা কম থাকছে বেশিদিন ধরে।

অসময়ের বৃষ্টি, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং বাহক-এই চারটি সূচক অনুকূলে থাকায় বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ছে। এডিস মশা একইসাথে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া এবং জিকা ভাইরাসের বাহক হতে পারে। এ মশা দিনের বেলায় একবারে গড়ে তিনজন মানুষকে হুল ফোঁটায়। তাই এক্ষেত্রে সচেতনতা খুব জরুরি।

সাধারণত ডেঙ্গু জ্বরে নিম্নবর্ণিত প্রাথমিক উপসর্গসমূহ দেখা যেতে পারে- তীব্র জ্বর, শরীরে লালচে র‍্যাশ, ঘাড়, পিঠ ও মাংসপেশিতে ব্যথা, অস্থিসন্ধি বা হাড়ে ব্যথা, চোখের পেছনে ও চারপাশে ব্যথা খাবারে অরুচি ও স্বাদের পরিবর্তন এবং কোষ্ঠকাঠিন্য।

এছাড়া অনেক সময় জটিল পরিস্থিতিতে নাক, মুখ ও দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তপাত, এমনকি মলের সঙ্গেও রক্তপাত হতে পারে। রক্তের প্লাটিলেট কমে গিয়ে শরীরের চামড়ার নিচে ইন্টারনাল রক্তক্ষরণও হয়ে থাকে। এছাড়া রোগী অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ করে এবং বমি বমি ভাবসহ বমি হতেও পারে।

সাধারণত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী বেশিরভাগ সময়ে পাঁচ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়। জটিল পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য জ্বরকে অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই উত্তম। তবে ডেঙ্গু জ্বরে প্রাথমিক কিছু পরিচর্যা করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রামে থাকা যথেষ্ট পরিমাণে পানি, শরবত, ডাবের পানি ও অন্যান্য তরল জাতীয় খাবার গ্রহণ করা। প্রয়োজনে খাবার খেতে না পারলে ডাক্তারের পরামর্শে শিরাপথে স্যালাইন দেওয়া। জ্বর কমানোর জন্য শুধুমাত্র প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ খাওয়া এবং ভেজা কাপড় দিয়ে গা মোছানো যেতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধের মূলমন্ত্রই হলো সচেতনতা। এডিস মশা স্বচ্ছ পরিষ্কার পানিতে ডিম পাড়ে; তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে এ মশার ডিম পাড়ার উপযোগী স্থানগুলোকে ধ্বংস করে দিতে হবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশক নিধনের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে-

- বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড়, জঙ্গল,জলাশয় ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ফুলদানি, অব্যবহৃত কৌটা, ডাবের খোসা, পরিত্যক্ত টায়ার ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে, যাতে তাতে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়তে না পারে। ব্যবহৃত জিনিসপত্রের কোথাও যেন পানি জমতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ঘরের বাথরুমে কোথাও জমানো পানি পাঁচদিনের বেশি যেন না থাকে। অ্যাকুরিয়াম, ফ্রিজ বা এয়ার কন্ডিশনারের নিচেও যেন পানি জমতে না পারে।
- এডিস মশা সাধারণত সকাল ও সন্ধ্যায় কামড়ায়। তাই দিনে ঘুমালেও মশারি টানিয়ে ঘুমানোই উত্তম। ঘরের চারদিকে দরজা জানালায় নেট লাগানো যেতে পারে।
- শিশুদের স্কুলে পাঠানোর সময় ফুল প্যান্ট বা পায়জামা পরিয়ে স্কুলে পাঠাতে হবে।
- ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই সব সময় মশারির মধ্যে রাখতে হবে, যাতে রোগীকে কোনো মশা কামড়াতে না পারে। মশক নিধনের স্প্রে, কয়েল ইত্যাদি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে দিনে ও রাতে মশারি ব্যবহার করতে হবে।

স্পানিস শব্দ ডিঙ্গা বা ডেঙ্গু মানেই হলো সতর্ক থাকা। এই রোগের প্রধান প্রতিষেধকই হচ্ছে সচেতন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। বর্ষায় মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগটি দেখা গেলেও এ বছর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে রোগটির প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃত্যু হয়েছে অক্টোবরে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের পক্ষ থেকে সবাইকে এডিস মশাবাহিত এ রোগ প্রতিরোধে ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি কোথাও যেন পানি না জমে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন। ■

সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ

নারীমুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া

নুসরাত জাহান

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) বাংলাদেশে বহুল আলোচিত একটি নাম। রোকেয়া তাঁর মূল নাম হলেও তিনি মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি মূলত লেখালেখির মাধ্যমে তৎকালীন মুসলিম নারীদের আলোকিত পথের আহ্বান জানান।

বেগম রোকেয়া ও তাঁর সাহিত্যকর্ম বুঝতে হলে সমকালীন প্রেক্ষাপট মনে রাখতে হবে। তিনি পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। বৃটিশ শাসিত ভারতের শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ন, সমাজ জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকারের যাবতীয় প্রশাসনিক সংস্কার মুসলিম সমাজকে একেবারে পঙ্গু করে দেয়। শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-কড়ি ও সাহিত্য সংস্কৃতি হারিয়ে তারা রীতিমতো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। নারীসমাজ পর্দার নামে নানা কুসংস্কারের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে যায়। এমনই এক ক্রান্তিকালের বেগম রোকেয়ার আবির্ভাব ঘটে। তিনি ১৮৮০ খ্রিঃ রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের একজন শিক্ষিত জমিদার ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী। রোকেয়ার দুই বোন করিমুন্নেসা ও হুমায়রা। তাঁর তিন ভাই যাদের একজন শৈশবেই মারা যান।

রোকেয়ার পিতা আবু আলী হায়দার সাবের আরবি, উর্দু, ফারসি, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। রোকেয়ার দুই ভাইও ছিলেন খুবই বিদ্যানুরাগী। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করে তাঁরা খুবই আধুনিক মনস্ক হয়ে ওঠেন। রোকেয়ার বড়ো বোন করিমুন্নেসাও ছিল সাহিত্যানুরাগী। বেগম রোকেয়ার শিক্ষালাভ, সাহিত্য চর্চা এবং সামগ্রিক মূল্যবোধ গঠনে বড়ো দুই ভাই ও বোন করিমুন্নেসার যথেষ্ট অবদান ছিল।

তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের ঘরের বাইরে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু এতেও রোকেয়া দমে যাননি। বড়ো ভাই-বোনদের সমর্থন এবং সহযোগিতায় তিনি বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি এবং আরবি আয়ত্ত করেন।

১৮৯৮ সালে রোকেয়ার বিয়ে হয় বিহারের ভাগলপুর নিবাসী উর্দুভাষী সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তদুপরি সমাজ সচেতন কুসংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি

সম্পন্ন উদার ও মুক্তমনের অধিকারী। স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় রোকেয়া দেশি-বিদেশি লেখকদের রচনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান এবং ক্রমশ ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাতও ঘটে স্বামীর অনুপ্রেরণায়। তবে রোকেয়ার বিবাহিত জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প-উপন্যাস, কবিতা-কৌতুক ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে তিনি সমকালীন সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মতিচূর, অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম। এছাড়া অজস্র কবিতা, পত্ররচনা, রসরচনা, কৌতুক সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর লেখা কিছুটা থেমে যায়। পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে আবার লিখতে শুরু করেন। রোকেয়া ভালো করেই জানতেন যে শিক্ষার আলোকস্পর্শ গৃহবদ্ধ নারীকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত কর বার সম্ভাবনা খুলে দেবে। তাই তো তিনি লিখেছেন, 'ঈশ্বর যে স্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতা অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা, এই গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ।'

তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর। বেগম রোকেয়ার নিরন্তর সংগ্রাম, লেখালেখি, স্কুল প্রতিষ্ঠা, গণসংযোগ, শিক্ষা আন্দোলন যা ভারতীয় উপমহাদেশে একটি বৈপ্লবিক অধ্যায়ের সূচনা করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি ছিলেন সামগ্রিক নারীমুক্তি আন্দোলনের দিশারী সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর অর্জন ও অবদান আমাদের হতবাক করে দেয়। রোকেয়া অধ্যয়নে আমাদের প্রয়োজন আরো ব্যাপক অনুশীলন, অনুসন্ধান এবং চর্চা। তবেই আমরা সঠিক পথে এগুতে পারব। ■

সম্পাদক, নবারুণ

তাসনিম জাহান রাদিয়া, প্রথম শ্রেণি, মেধা কিন্ডার গার্ডেন, নাটোর

হেমন্তের আনন্দ

নাফিজ আহমেদ

নতুন ধান মাড়াতে ব্যস্ত
গ্রামের কৃষান-কৃষানির দল
জোছনা মাখা রাতে
আনন্দে করছে কোলাহল!

রান্নার ফাঁকে কৃষাণ বধূ
ঝাড়ে কুলায় নতুন ধান
ঢেঁকি নাচের তালে
গেয়ে উঠে হেমন্তের গান

নতুন ধানের পিঠা
লাগে ভারি খেতে
নবান্নে গ্রামের সবাই
উৎসবে উঠে মেতে।

৮ম শ্রেণি, নরসিংদী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদী

হাঁসের ছানা

ইমরান খান রাজ

হাঁসের ছানা চটপট
করে শুধু ফটফট,
দেখতে লাগে উদ্ভট
দৌড় দিয়ে চম্পট।

সারাদিন ছোটাছুটি
করে শুধু খাই খাই,
প্যাঁক প্যাঁক ডাকে তারা
আর কোনো কাজ নাই।

শিক্ষার্থী, ব্যবস্থাপনা বিভাগ,
শেখ বোরহানউদ্দিন
পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা

ধানের গন্ধে

আবির হোসেন

নতুন ধানের গন্ধে
মৌ মৌ করছে দেশ
খোকা-খুকি খাচ্ছে পিঠা
মজা করে বেশ।

বাংলার মাঠে প্রান্তরে
পড়েছে ধান মাড়াইয়ের ধুম
সবাই অনেক ব্যস্ত থাকে
হয় না সময়মতো খাওয়া-ঘুম।

৭ম শ্রেণি, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

ফড়িং

নুসরাত জাহান নূর

টুনটুনা টুন
ফড়িং নাচে
গুন গুনা গুন গায়
লাল ফড়িঙের লেজটা
কেমন বাঁকা হয়ে যায়।

২য় শ্রেণি, জিনিয়াস প্রি ক্যাডেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ
আদমজী নগর, কদমতলি, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

অলৌকিক কৈলাস পর্বত

শাহনেওয়াজ কবীর

প্রকৃতির এক বিস্ময় লুকিয়ে আছে কৈলাস পর্বতে। এ পর্বতের নাম শোনেনি এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান হলো কৈলাস পর্বত। যা কিনা খোদ ঈশ্বরের বাসভূমি। এখান দিয়েই নাকি স্বর্গে আরোহণের পথ। হিন্দু ধর্মীয় পুরাণে কৈলাসকে শিবের লীলাধাম বলা হয়েছে। হিন্দুদের মান্যতা অনুসারে ভগবান শিব এই পর্বতেই বাস করতেন। আর সেখানেই ওনার সমাধি আছে। বৌদ্ধ আর জৈনধর্ম অনুযায়ীও পবিত্র স্থল বলা হয় কৈলাসকে। তিব্বতের বৌদ্ধদের অনুযায়ী, পরম আনন্দের প্রতীক বুদ্ধ ডেমচোক (ধর্মপাল) কৈলাস পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা। আর জৈনধর্মে কৈলাসকে অষ্টাপদ বলা হয়। তাঁদের ধর্ম অনুসারে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋশভহদেব এখানেই শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। আর তাই গোটা হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে কৈলাসের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। এটি কসমিক অ্যাক্সিস বা ওয়ার্ল্ড পিলার নামেও পরিচিত। সংস্কৃতে কেলাস থেকে কৈলাসের উৎপত্তি। কারণ বরফে ঢাকা কৈলাসকে দেখতে স্ফটিকের মতো মনে হয়। তিব্বতি ভাষায় এর নাম গাঙ্গো রিনপোচে। তিব্বতে বৌদ্ধ গুরু পদ্মসম্ভবাকে বলা হয় রিনপোচে। তার থেকেই নামকরণ হয়েছে কৈলাস পর্বতের। এর অর্থ হলো- বরফের তৈরি মূল্যবান রত্ন।

প্রথমদিকের মহাদেশগুলোর সংঘর্ষে এই পর্বত তৈরি হয়েছিল বলে জানা যায়। একটি মহাসাগরের মৃত্যু কৈলাস পর্বতমালার শিলার জন্মের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। ভৌগোলিকভাবে কৈলাস পাহাড় আছে তিব্বত মালভূমিতে চিন-তিব্বত ভূখণ্ডে । ছটি পর্বত শ্রেণি পদ্মফুলের পাঁপড়ির মতো ঘিরে আছে কৈলাস পাহাড়কে । এর ভূ-তাত্ত্বিক গুরুত্ব কোনো অংশেই এর আধ্যাত্মিক গুরুত্বের চেয়ে কম নয়। ভূ-তত্ত্ব আর অতীন্দ্রিয়বাদ এসে মিশে গেছে কৈলাসে। চারটি নদী দ্বারা বেষ্টিত কৈলাস পর্বতকে দেখলে পিরামিড মনে হয়। অনেকে তো আবার বিশ্বের সর্ববৃহৎ পিরামিডও বলে থাকেন। পর্বতের গায়ে অনেক প্রাচীন গুহা রয়েছে। পর্বতের একদম চূড়ায় কোনো বরফ জমে না। কারণ পর্বতটি এতটাই খাড়া যে, বরফ নিচে পড়ে যায়। আর ওই বরফ গলে গিয়ে উৎপত্তি হয় নদীগুলোর। তাই হয়তো কেউ উঠতেও পারেনি। হিমালয়ের প্রথম ও প্রধান রেঞ্জ হিসেবে শ্বেত-শুভ্র কৈলাস পর্বত দাঁড়িয়ে আছে। আরও অদ্ভুত বিষয় হলো, বিজ্ঞানীরা বলছেন কৈলাসে নাকি কোনো চুম্বকীয় ক্ষেত্র নেই। যে কারণে কোনো কম্পাস কাজ করে না।

কৈলাস পাহাড়ের পায়ের কাছে ১৪,৯৫০ ফুট ওপরে আছে মানস সরোবর এবং রাক্ষসতাল হ্রদ । এ দুই হ্রদ এশিয়ার বেশ কিছু দীর্ঘতম নদীর উৎস। প্রকৃতির আজব সৃষ্টি! দুই হ্রদ পাশাপাশি আছে। যত জোরেই হাওয়া থাকুক, মানস সরোবরের জল সব সময়ই শান্ত কিন্তু রাক্ষসতালের জল সবসময় অশান্ত থাকে। হ্রদগুলোর আকৃতিও রহস্যময়। মানস সরোবরপূর্ণ গোলাকার এক জলাশয়। রাক্ষসতালের আকৃতি অর্ধচন্দ্রাকার। এরা নাকি সূর্য ও চন্দ্রের শক্তিকে প্রকাশ করে। রামায়ণে বলা হয়েছে শিবের পরম ভক্ত রাবণ তপস্যা বলে সৃষ্টি করেছিলেন এই হ্রদ শিবকে প্রসন্ন করার জন্য। রাক্ষসরাজ রাবণ যে প্রখর তপস্যা করেছিলেন, তার থেকেই রাক্ষসতালের সৃষ্টি বলে মনে করা হয়। সেই কারণেই এই হ্রদের জল অশান্ত। এই হ্রদের জল নোনতা এবং এখানে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায় না।

আজ পর্যন্ত কোনো মানুষই এই পর্বতে চড়াই করতে পারেনি। যে এই পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করেছে, তাঁরই মৃত্যু হয়েছে। আর এটা নিয়ে অনেক কথাও প্রচলিত আছে। তিব্বতে প্রচলিত প্রাচীন কিংবদন্তি হলো, গুরু মিলারেপাই শুধু পা রাখতে পেরেছিলেন কৈলাসের চূড়ায়। ফিরে এসে তিনি নিষেধ করেছিলেন এ পর্বত জয়ে যেতে। কারণ একমাত্র সে-ই মানুষ পারবে এর চূড়ায় যেতে, যার গায়ে কোনো চামড়া নেই। ঈশ্বরের বাসস্থানে না যাওয়াই ভালো।আধুনিক পর্বতারোহীরাও বলছেন, মাউন্ট কৈলাস জয় করা অসম্ভব বিষয়।

মানস সরোবর

১৯৯৯ সালে রাশিয়ার এক চক্ষু বিশেষজ্ঞ এর্নেস্ট মুলদাশিফ ঠিক করেন কৈলাস পর্বতের রহস্য উন্মোচন করবেন। তদন্ত করার পর এর্নেস্ট মুলদাশিফ জানান, 'কৈলাসে একটি বড়ো পিরামিডকে অনেক ছোটো ছোটো পিরামিড ঘিরে আছে আর সেখানে ঘটে অলৌকিক ঘটনা। রাতের নিস্তব্ধতায় পাহাড়ের

ভেতর থেকে ফিসফিস করে কথা বলার শব্দ আসে। এক রাতে আমি আর আমার দুই সহযোগী পাথর পড়ার আওয়াজ পেয়েছি। আর এ আওয়াজ কৈলাস পর্বতের পেটের ভেতর থেকে আসছিল। আমরা ভেবেছিলাম, পিরামিডের মধ্যে হয়ত কোনো শক্তি আছে, যারা ঠিক মানুষের মতোই কথা বলছে।

তিনি আরও লিখেছিলেন, যে শাম্বালা একটি আধ্যাত্মিক দেশ। এটা কৈলাস পর্বতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে এ বিষয়ে চর্চা করা কঠিন। তবে, কৈলাস পর্বতের এলাকা পৃথিবীর বাইরের জগতের সঙ্গে জড়িত।

রাক্ষসতাল সরোবর

তারপরেও নাকি অনেকে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারা হয় পথভ্রষ্ট হয়েছেন, অথবা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে মারা গিয়েছেন। কখনো আজব কাণ্ডও ঘটে, যখন এ পর্বতে কোনো পর্বতারোহী ওঠার চেষ্টা করেন। কিছুদূর ওঠার পরই প্রকৃতি তার ভয়াবহ রূপ দেখায়। শুরু হয় ঝড়, তেড়ে আসে পাথরের টুকরো। অনেক সময় পর্বতারোহীরা পা পিছলে পড়েও যান। ফলে অধরাই থেকে গিয়েছে কৈলাস পর্বতের চূড়া।

ইউরোপের অকাল্টবাদীরা কৈলাসকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁদের মতে, এখানে অতিপ্রাকৃত শক্তির অবস্থান। অনেকের মতে এ পর্যন্ত যারা কৈলাস পর্বতে ওঠার চেষ্টা করেছেন; তাদের সঙ্গেই ঘটেছে অতিপ্রাকৃত ঘটনা। কিছুক্ষণ পরই শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দেয়। অকাল বার্ধক্য চলে আছে পর্বতারোহীর শরীরে। এমনকি মাথার চুল ও হাতের নখ বাড়তে থাকে দ্রুতগতিতে! সাধারণভাবে মানুষের নখ-চুল যে হারে বাড়ে, কৈলাস পাহাড়ে অন্তত ১২ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করলে এ বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হয়ে যায়। কথিত আছে, একবার কয়েকজন সাইবেরিয়ান পর্বতারোহী কৈলাস পর্বতের নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বয়স কয়েক দশক বেড়ে যায় এবং এর এক বছর পরেই বয়সজনিত কারণে মৃত্যু হয় তাদের। এ রকম হাজারো বিস্ময়ের ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৈলাস পর্বত। যদিও এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনো মেলেনি।

এটাও শোনা যায় যে, ১৯ এবং ২০ শতাব্দীতে কিছু পর্বত আরোহী এই পাহাড়ে চড়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সবাই উধাও হয়ে গেছেন।

যদিও কেউ এখনো এর চূড়ায় ওঠেনি তবে লাখ লাখ তীর্থযাত্রী হাজারো বছর ধরে এর আশপাশে ঘুরছে সুখী হওয়ার আশায়। অনেকেই বারবার অবনত হয়ে পর্বতের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে চারপাশে যে ৫০ কিলোমিটার ট্র্যাক আছে, সেই পথে হেঁটেছেন।

২২ হাজার ফুট উচ্চতার কালো পাথরের এই কৈলাস পর্বতকে প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর স্তম্ভ বলে মনে করা হয়, যা ধরে রেখেছে পৃথিবীর ভর। কিন্তু অজেয়। ■

শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

অদ্ভুত মহাকাশযান

মো. জোবাইদুল ইসলাম

নিতুন টেলিস্কোপ নিয়ে ছাদে উঠেছে। রাতে সে টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশে নতুন নতুন তারা খুঁজে। আর খুঁজে তার বইয়ে পড়া অদ্ভুত মহাকাশযানগুলোকে। কিছুদিন আগে সে দেখেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের নতুন একটি তারা। দেখে তো সে অবাক। এমন তারা সে আগে কখনো দেখেনি। সব তারা ঝিকমিক করে আলো ছড়ায়। কিন্তু এ তারা আলো ছড়ানোর পরিবর্তে অন্য তারা থেকে আলো চুষে নেয়। নিতুনের বাবা একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নিতুন তার বাবাকে এই তারার ব্যাপারে বললে তিনিও টেলিস্কোপে চোখ রাখেন তারাটি দেখতে। দেখে তিনিও কিছুটা অবাক হয়ে যান কারণ এমন তারা তিনি আগে কখনো দেখেননি। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নেন এই তারা নিয়ে গবেষণা করার।

আজও এমন কোনো নতুন তারা খুঁজছে নিতুন। টেলিস্কোপে চোখ রেখে দূরদূরান্তের তারাগুলোকে দেখছে সে। এমন সময় নিতুনের টেলিস্কোপে দেখা যায়, মহাকাশযান সদৃশ হরেক রঙের আলোয় ভরা উড়ন্ত কোনো কিছু। নিতুন এর আগেও অনেক মহাকাশযান দেখেছে টেলিস্কোপে এবং টিভিতে। কিন্তু এটা কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের যান মনে হলো নিতুনের। নিতুন ভালো করে যানটিকে দেখতে চেষ্টা করল। যানটি গোলাকার দেখতে। উজ্জ্বল আলোর বিভিন্ন রঙের লাইট জ্বলছে। এতটুকু দেখতেই চোখের পলকে যানটি হাওয়া হয়ে গেল। নিতুন টেলিস্কোপ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে অনেক খুঁজল যানটিকে কিন্তু কোথাও আর দেখতে পেল না।

হঠাৎ নিতুনের বাবা তার যন্ত্রপাতি নিয়ে ছাদে আসেন। নিতুন তার বাবাকে সদ্য টেলিস্কোপে দেখা যানটির কথা বলল। নিতুনের বাবা বলল, নিতুন! শোনো,

ওগুলো ঠিক মহাকাশযান নাকি অন্যকিছু তা বিজ্ঞানীরা এখনও সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা ওই অদ্ভুত আলো ছড়ানো যানগুলোর নাম দিয়েছে 'ইউএফও' যার বাংলা অর্থ হলো– 'অশনাক্ত উড়ন্ত বস্তু'। বিশ্বের অনেক দেশে এমন অনেক উড়ন্ত যান মানুষ দেখেছে। কিন্তু এই উড়ন্ত যানগুলো চোখের পলকে আবার উধাও হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা এই যান সদৃশ বস্তুগুলো নিয়ে গবেষণা করছে। কেউ কেউ আবার এই উড়ন্ত যানগুলোকে 'এলিয়েন শিপ'ও বলে থাকে। কোনো দেশ একবার এই রকম উড়ন্ত যান দেখে সে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেনারা তাদের যুদ্ধবিমান নিয়ে ওই যানটিকে তাড়া করে। এমনকি তারা যানটিকে লক্ষ্য করে বোমা ছুড়তে চাইল কিন্তু তখন বোমা ফেলার সুইচটি কাজ করছিল না। আর মুহূর্তেই সেই যানটিও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কী কারণে তখন সুইচটি কাজ করেনি! তা আজও এক রহস্য। নিতুন এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। আর বলল, বাবা! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমার থেকে অদ্ভুত যানগুলো সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা হলো। ■

এইচএসসি, সুফিয়া নুরিয়া ফাজিল মাদ্রাসা মীরসরাই, চট্টগ্রাম

মহাকর্ষ সূত্র

লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

'মহাকর্ষ' নাম শুনলেই মাথায় আসে 'নিউটন'
একটা আপেল মাথায় পরায় সূত্রের উদ্ভাবন।

আপেলটা কেন মাথায় পড়ল
যেতে পারত আকাশে
কেন নিউটন ভাবে নাই যে,
কোথায় পাবে পাখা সে!

আপেল নিয়ে গবেষণার শুরু করলেন তিনি
কৌতূহলের শেষ নাই তাঁর, হলেন আরো জ্ঞানী।
বুঝলাম তাঁর জ্ঞান বাড়ল, বিজ্ঞান করল বশ
তবে কেন ফাসলাম আমরা, না করে কোনো দোষ?!
আজব এসব সূত্রের খপ্পরে, পরে জীবন শেষ,
না বুঝলে কান্না আসে বুঝলে লাগে বেশ।

৮ম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

বিশ্বের বিস্ময় বুর্জ খলিফা

মো. জাবের আব্দুল্লাহ

পৃথিবীর সবচাইতে উচ্চতম এবং বহুতল ভবন বুর্জ খলিফা। দুবাই শহরের শেখ জায়েদ রাস্তার পাশে ২০১০ সালে নির্মিত 'বুর্জ খলিফা' ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবনের মর্যাদা নিয়ে। ১৫০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত রকেট আকৃতির এই ভবনটির উচ্চতা ৭১৭ ফুট। মাটি থেকে ভবনটির উচ্চতা এতই উঁচু যে সূর্যাস্তের পরও প্রায় দুই মিনিট ধরে উপরের তলার মানুষ সূর্য দেখতে পায়। এ কারণেই রমজান মাসে সর্বোচ্চ তলায় থাকা মানুষটি ইফতারি করেন একই ভবনের নিচ তলায় থাকা মানুষের দুই মিনিট পর। বুর্জ খলিফা শুধু উচ্চতায় শ্রেষ্ঠ নয় রয়েছে অনেক বিশ্বরেকর্ড। বন্ধুরা এসো জেনে নেই বিস্ময়কর এই ভবনটির নির্মাণ কৌশল এবং অজানা কিছু তথ্য।

'বুর্জ' আরবি শব্দ। এর অর্থ টাওয়ার। দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রাশেদ আল মাখতুম ২০১০ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ভবনটির উদবোধন করেন। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সম্মানে ভবনটির নামকরণ করেন বুর্জ খলিফা। নির্মাণের সময় 'বুর্জ দুবাই' নামে এর নামকরণ হলেও উদবোধনের সময় এর নাম পরিবর্তন করে বুর্জ খলিফা রাখা হয়। ভবনটির আরেক নাম 'দুবাই টাওয়ার'।

বিশ্বের সুউচ্চ এই ভবনটি নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০০৪ সালে। আর শেষ হয় ২০০৯ সালে। ভবনের প্রধান স্থপতি আদ্রিয়ান স্মিথ। আর প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন সুফিয়ান আল জাবিরি। ভবনটিতে বাংলাদেশি স্থপতি ফজলুর রহমান খানের আবিষ্কৃত 'বান্ডেল টিউব' পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যার ফলে সুবিশাল এই ভবনে মাত্র ৪ হাজার টন লোহা ব্যবহার করেই নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। ভবনের মূল নকশার ধারণাটি মূলত গ্রহণ করা হয় নবম শতকে নির্মিত ইরাকের সর্পিলাকার একটি মসজিদের কাঠামো থেকে। দুবাই ধূলিঝড়প্রবণ একটি শহর। ভবনটি এমন সর্পিলাকৃতির হওয়ায় প্রচণ্ড ধূলিঝড় ও ঘূর্ণিঝড় থেকে অধিক সহনশীল করেছে।

বুর্জ খলিফার অভ্যন্তরীণ তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য জানালার রয়েছে

বিশেষ কাচের ব্যবস্থা। যার ফলে বাহিরে প্রচণ্ড উত্তাপ থাকলেও ভবনের ভেতরের তাপমাত্রা থাকে স্বাভাবিক। রয়েছে ২৪,৩৪৮টি জানালা। আবার এসব জানালা পরিষ্কারের জন্য আছে তিনটি ট্রাক।

এই উচ্চাভিলাষী অট্টালিকা নির্মাণে প্রায় ১২ হাজার শ্রমিক টানা ৬ বছর কাজ করেছেন। প্রতি তিনদিন পর পর ছাদ ঢালাই দেয়া হতো। প্রচণ্ড গরমের কারণে অনেক সময় রাতে কাজ করার প্রয়োজন হতো।

বুর্জ খলিফার ভিতরে রয়েছে ৪টি সুইমিং পুল। যার একটি ৪৩ তলায় অপরটি ৭৬ তলায়। আর বাকি দুটি সুইমিং পুল রয়েছে 'দ্য ক্লাব'-এর ছাদের (রুফটপ) এক পাশে। 'দ্য ক্লাব' হলো বুর্জ খলিফার একটি শরীরচর্চা কেন্দ্র।

বুর্জ খলিফার ১২৩ তলায় বইপ্রেমীদের জন্য রয়েছে একটি লাইব্রেরি। ভবনের ৪৩, ৭৬ এবং ১২৩ তলায় রয়েছে কাচ দিয়ে ঘেরা হল ঘর (স্কাই লবি)। বড়ো বড়ো অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য এগুলো ভাড়া নেওয়া হয়।

পৃথিবীর উচ্চতম আউটডোর অবজারভেশন ডেক রয়েছে বুর্জ খলিফার ১৪৮ তলায়। ৫৫৫ মিটার উঁচুতে হওয়ায় এই জায়গাটি থেকে দুবাই শহরটিকে ছবির মতো দেখায়। বুর্জ খলিফা থেকে ১৫৩ কিলোমিটার দূরে ইরানের সমুদ্র উপকূলও এখান থেকে দেখা যায়।

ভবনের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য বাহিরের দৃশ্যের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। বাছাইকৃত ১০০০ চিত্রকর্ম দিয়ে ভবনের অভ্যন্তর সাজানো। এখানে প্রবেশ করতে দর্শনার্থীদের গুণতে হয় মোটা অঙ্কের টাকা। ১৬০ তলার পর আবার এই টাকার পরিমাণ আরো বেশি হয়। ৯ থেকে ১৬তলা পর্যন্ত আমেরিকানদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ১৯ থেকে ৩৭ তলা এবং ৭৭ থেকে ১০৮ তলায় রয়েছে থাকার ব্যবস্থা। ১২৪ তম তলায় প্রকৃতি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

এটি বিশ্বের দীর্ঘতম এবং দ্রুততম এলিভেটর বা লিফট বিশিষ্ট ভবন। এলিভেটরগুলো ডাবল ডেকার এবং আটটি এস্কেলেটরবিশিষ্ট। এগুলো ১০ মিটার/সেকেন্ড গতিতে ওঠানামা করে এবং প্রতি কেবিনে ১২ থেকে ১৪ জন মানুষ পরিবহণ করতে পারে। লিফটে চড়ে নিচতলায় থেকে ১২৪ তলা পর্যন্ত যেতে সময় লাগে ১ মিনিট।

বুর্জ খলিফার সৌন্দর্য শুধু ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়। এর বাহিরে পার্ক ও ঝর্না দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মনোরম পরিবেশ। বুর্জ খলিফার মূল প্রবেশ পথের ধারেই রয়েছে নীলাভ পানির একটি ঝর্না, যা তৈরি করতে খরচ হয়েছে ১৩৩ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড। ৬৬০০টি রঙিন বাতি রাতে কৃত্রিম ঝর্নায় অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। ভবনের চার পাশে রয়েছে মনোরম বুর্জ খলিফা পার্ক। 'হাইমেনোক্যালিস' নামক এক প্রকার মরু উদ্ভিদের আদলে তৈরি করা হয়েছে এটি। ■

প্রাবন্ধিক

সোনামনি

রওশন আরা ভূইয়া

সোহেল মনি সোনার খনি
সোহেল আমার সোনার চাঁদ
তার নাইকো তুলনা আর
সোহেল আমার সর্বক্ষণ।
পড়ালেখায় দেয় মন
চলে ভালোভাবে
মিশে না কারো সাথে
দোয়া করবেন আপনারা।
আমার সোহেল মনিকে
বড়ো হয়ে যেন উড়ে নীল আকাশে
সবাই যেন চিনে আমার
সোহেল মনিকে।
এই কামনা করি আমি
মহান আল্লাহর কাছে।

নয়ন ও তার বন্ধুর টিয়াপাখিটি

তালুকদার ফারহান আল আবরার

নয়নদের বাড়ির সামনেই ফুল-ফলে ভরপুর একটি বড়ো বাগান। সেই বাগানে নয়ন তার বন্ধু অয়ন, রিফাত ও সিয়ানকে নিয়ে প্রতিদিন বিকেলে খেলা করে। একদিন বিকেলে নয়ন খেলতে খেলতে খেয়াল করল যে পাশের বড়ো লিচু গাছটির নিচে মাটিতে একটি টিয়া পাখি পড়ে আছে। সে তার বন্ধুদের তৎক্ষণাৎ ডেকে সেই লিচু গাছের নিচে পড়ে থাকা টিয়া পাখিটি দেখালো। নয়ন ও তার বন্ধুরা সেই টিয়া পাখিটির কাছে গেল এবং সবাই পাখিটিকে ঘিরে দাঁড়াল। আসলে টিয়া পাখিটি অসুস্থ হয়ে সেখানে পড়েছিল। নয়নের কোনো বন্ধুই টিয়া পাখিটিকে মাটি থেকে উঠালো না। পাখিটির জন্য নয়নের মায়া হলো। তাই নয়ন নিজেই সেই টিয়া পাখিটিকে যত্ন সহকারে উঠালো এবং নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গেল।

তারপর সে টিয়া পাখিটির অনেক যত্ন নিল। মুখে তুলে খাবার খাওয়ালো। তার পরিচর্যায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই টিয়া পাখিটি সুস্থ হয়ে উঠল। তার কয়েকদিন পর নয়ন সেই টিয়া পাখিটিকে মুক্ত বাতাসে ছেড়ে দিলো। কিন্তু সেই পাখিটি আকাশে একটু উড়েই আবার নয়নের কাছে ফিরে এল। নয়ন তখন বুঝতে পারল তার প্রতি টিয়া পাখিটির মায়া জন্মেছে, তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। তখন থেকে তারা একে অপরের বন্ধু হয়ে গেল।

এরপর নয়ন সেই টিয়া পাখিটিকে একটি খাঁচায় যত্ন করে রাখল। আদর করে নয়ন সেই টিয়া পাখিটিকে কথা বলা শেখাতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই টিয়া পাখিটি কথা বলতে শিখে গেল। নয়ন রোজ বিকেলে টিয়া পাখিটির খাঁচা খুলে দিত। নীল আকাশে পাখিটি কিছুক্ষণ ওড়াউড়ি করার পর সন্ধ্যার আগেই আবার তার কাছে ফিরে আসত।

বরাবরের মতো একদিন বিকেলে নয়ন টিয়া পাখিটির খাঁচা খুলে দেয় এবং টিয়া পাখিটি উড়ে যায়। কিন্তু সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ার পরেও টিয়া পাখিটি ফিরে আসে না। নয়নের বিশ্বাস যে টিয়া পাখিটি নিশ্চয় তার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু টিয়া পাখিটি আর ফিরে আসে না। তাই সে টিয়া পাখিটিকে খোঁজার জন্য বাইরে বের হলো। সে তাদের বাড়ির আশপাশের সব জায়গায় খুঁজল কিন্তু টিয়া পাখিটিকে কোথাও খুঁজে পেলো না।

পরের দিন সকালবেলা সে একটি বড়ো মাঠে পা বাঁধা অবস্থায় টিয়া পাখিটিকে পড়ে থাকতে দেখল। সে টিয়া পাখিটিকে উঠালো এবং পায়ের বাঁধন খুলে দিলো। হারানো টিয়াকে খুঁজে পেয়ে নয়ন অনেক খুশি হলো। মনের আনন্দে সে টিয়া পাখিটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। এরপর থেকে নয়ন আর কখনো টিয়া পাখিটির খাঁচা খুলে দিত না। সময় পেলেই প্রায় সারাদিনই তার সাথে খুনসুটিতে মেতে থাকত। ■

৪র্থ শ্রেণি, শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমি, শেরপুর

ছয়বার ওয়ার্ল্ড গিনেস রেকর্ড

একবার বা দুইবার নয় ছয়বার নাম লিখিয়ে তাক লাগিয়েছে বাংলাদেশের ছেলে রাসেল। বাড়ি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রহিমানপুর ইউপির হরিহরপুর সিরাজপাড়া গ্রাম। বয়স ২০ বছর। পড়েন শিবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে। সে বাম স্কিপ বা বসে ঘুরিয়ে দড়ি লাফানো খেলায় ভারত ও জাপানকে টপকে বিশ্ব দরবারে কৃতিত্ব গড়েছেন। রাসেল ১ মিনিটে ১৬০ বার ও ৩০ সেকেন্ডে ১১৭ বার বসে দড়ি লাফিয়ে ২টি রেকর্ড গড়েন। ইতোমধ্যে ওয়ার্ল্ড গিনেস বুক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সনদ দুটি হাতে পেয়েছেন। এ নিয়ে ছয়বার স্কিপিং রোপে গিনেস বুকে রেকর্ডের মালিক এখন তিনি। রাসেলের সর্বশেষ ৩০ সেকেন্ডে ১১৭ বার বসে দড়ি লাফানোর বিশ্ব রেকর্ডস-এর সংবাদটি ফলাও করে প্রচার করেছে ভারতের গণমাধ্যম এনডিটিভিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

২০১৯ সাল থেকে রোপে একের পর এক রেকর্ড গড়ছে রাসেল। তখন স্কিপিং রোপে ৩০ সেকেন্ডে এক পায়ে ১৪৫ বার দড়ি লাফিয়ে রেকর্ড করে। পরে আরেকটি ইভেন্টে ১ মিনিটে ২৫৮ বার লাফিয়ে রাসেল রেকর্ড করে। এ রেকর্ডটি হাতছাড়া হয়ে যায়। ২৫৯ বার লাফিয়ে ভাঙেন ভারতের একজন। পরে ২৬২ বার লাফিয়ে রাসেল পুনরুদ্ধার করে আগের রেকর্ড। এর আগে স্কিপিং রোপ এক জাম্পে ২ বার দড়ি ঘোরানো ইভেন্টে ৩ মিনিটে ৪৫৮ বার লাফিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে এই তরুণ। রাসেলের এ অর্জনে খুশি পরিবার, স্বজন ও এলাকাবাসী। তার লক্ষ্য দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অলিম্পিকসহ বড়ো বড়ো ম্যাচগুলোতে অংশ বিশ্বের বুকে দেশের নাম উঁচুতে নিয়ে যেতে।

রেকর্ড গড়া রাসেল ইসলাম জানান, ২০২১ সালের প্রথম দিকে বসে দড়ি লাফানোর দুটি রেকর্ডে ভাঙার চ্যালেঞ্জের আবেদন করি। আবেদনের ৩ মাসের মধ্যে গিনেস কর্তৃপক্ষ মেইলের মাধ্যমে যাবতীয় দিকনির্দেশনা দেন। তাদের নির্দেশনা মতে প্রথম দফায় ১ মিনিটে ১৬০ বার বসে দড়ি ঘুরিয়ে রেকর্ড করি। এর আগে এ রেকর্ড ছিল এক ভারতীয় যুবকের। তিনি ১ মিনিটে ১৪৯ বার স্কিপিং ঘুরিয়েছে। এরপর এ বছরের ১৩ মার্চ আবারো বসে ৩০ সেকেন্ডে ১১৭ বার বাম স্কিপ করে গিনেস বুকে রেকর্ড করি। তার আগে এই রেকর্ড ছিল জাপানের এক নাগরিকের। তিনি ৩০ সেকেন্ডে স্কিপিং ঘুরিয়েছে ১০৩ বার।

এরই মধ্যে রাসেলকে রোপ-স্কিপিংয়ে প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন। আমাদের ফেডারেশনের কয়েকটি ক্যাটাগরি রয়েছে। রোপ স্কিপিং হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম। তার মাধ্যমে তৃণমূল থেকে জাতীয় খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে আশা করি। ■

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

ঝড়ের নামকরণ

সম্প্রতি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের উপর আঘাত হেনেছিল ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং। সিত্রাং নিয়ে আজকের এই প্রতিবেদন। প্রশ্ন হলো ঝড়টির নাম সিত্রাং কেন বা এর আগে আরো অনেক ঝড় হয়েছে যেমন– আইলা, আম্ফান, ফনি ইত্যাদি। এসবের নাম কোথা থেকে এল, আর কারা-ই বা রাখলো এদের নাম। হ্যাঁ বন্ধুরা এবার জেনে নাও সেসব তথ্য।

আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের সূত্র মতে, সাধারণত সমুদ্রে সৃষ্ট কোনো ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৯ মাইলের বেশি হলেই সেই ঝড়টি একটি নাম পায়। অন্যদিকে কোনো ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৭৪ মাইল ছাড়িয়ে গেলে তাকে হারিকেন, সাইক্লোন বা টাইফুন হিসেবে ভাগ করা হয়।

জানা যায়, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার অধীনে ভারত মহাসাগরের উত্তরাঞ্চলে সৃষ্ট ট্রপিক্যাল সাইক্লোনের নামকরণের জন্য একটি কমিটি রয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও সেই কমিটিতে রয়েছে আরো ১২টি দেশ; সেগুলো হলো মিয়ানমার, ভারত, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, সৌদি আরব ও ইয়েমেন।

এই ১৩ দেশের আবহওয়াবিদদের সংস্থা এস্কেপ ২০২০ সালেই ১৬৯টি ঘূর্ণিঝড়ের নাম ঠিক করে রাখে। সেই তালিকা থেকে এবারের ঘূর্ণিঝড়ের নাম দেওয়া হয় 'সিত্রাং'। এ নামটি থাইল্যান্ডের দেওয়া। ভিয়েতনামিজ ভাষায় এর অর্থ 'পাতা'। আবার থাইল্যান্ডের বাসিন্দাদের পদবিও।

এর আগে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশের দেওয়া 'ফণী', পাকিস্তানের 'তিতলি', মালদ্বীপের 'আইলা', থাইল্যান্ডের 'আমফান'। এমনকি সিত্রাংয়ের পরবর্তী ঝড়ের নামও ঠিক করা আছে আগে থেকেই। এরপরের ঝড়ের নাম হবে 'মন্দোস'। যার নামকরণ করেছে সৌদি আরব। এরপরের ঝড়টির নাম হবে 'মোচা'। যেটি ইয়েমেনের দেওয়া।

শুরুতে আবহাওয়াবিদরা মিলে মেয়েদের নামে ঝড়গুলোর নামকরণ করতেন। ১৯৫৩ সালে ইউএস ওয়েদার সার্ভিস আনুষ্ঠানিকভাবে Q, U, X, Y, Z ব্যতীত A থেকে W পর্যন্ত আদ্যক্ষরে মেয়েদের নামে ঝড়ের নামকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে এসে প্রতিবাদের মুখে ১৯৭৮ সাল থেকে ছেলেদের নামেও ঝড়ের নামকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বছরের প্রথম ঝড়ের নাম রাখা হতো অ আদ্যাক্ষর দিয়ে, দ্বিতীয় ঝড়ের নাম রাখা হতো B দিয়ে, এভাবে চলতে থাকত। আবার জোড় সালের ঝড়গুলোর নাম রাখা হতো পুরুষের নামে আর বিজোড় সালের ঝড়গুলোর নাম রাখা হতো নারীদের নামে।

এক বছরে ২১টির বেশি হারিকেন উৎপন্ন হলে (২০০৫ সালের মতো) গ্রিক বর্ণমালা অনুযায়ী নামকরণ করা হয়- হারিকেন আলফা, বিটা ইত্যাদি। ■

তথ্যসূত্র: বিবিসি

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

শিশু থাকুক যত্নে

ঋতু পরিবর্তনের ফলে শিশুরা খুব অল্পতেই অসুস্থ হয়ে পড়তে পরে। তাই শিশুর যত্নে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। আর সাথে শিশুর চাই বাড়তি যত্ন। নবজাতক শিশুকে উপযুক্ত আরামদায়ক ও হালকা গরম কাপড় গায়ে দিতে হবে। অবশ্যই শিশুদের জন্য কয়েক জোড়া কাপড় ব্যবহার এবং তা পরিষ্কার করে ধুয়ে ভালো করে রোদে শুকাতে হবে।

শুধু ঠান্ডা লাগার কারণেই যে বাচ্চা অসুস্থ হবে তা নয় বরং অসুখের মূল কারণ বায়ুবাহিত বিভিন্ন রোগজীবাণু যা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে শিশুদের সহজেই আক্রমণ করে। আর সেই সাথে থাকে প্রচুর ধুলোবালি যা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে নাক দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করলে গলায় কিংবা নাকে প্রদাহ, সর্দি, কাশিসহ বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। অতিরিক্ত দূষিত ধোঁয়া এবং ধুলো শিশুদের নিউমোনিয়া কিংবা ব্রঙ্কাইটিসের মতো সমস্যাও সৃষ্টি করতে পারে। ভালোভাবে হাত না ধুলে এর মাধ্যমে অনেক রোগব্যাধি ছড়ায়। বিশেষ করে শিশুদের ভালোভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস করাতে হবে। এ সময় কুসুম গরম পানিতে শিশুকে হাত ধুতে দিন, কারণ ঠান্ডা লাগার ভয়ে শিশু ভালোভাবে হাত না ধুলে সর্দি, কাশি ও নিউমোনিয়ার জীবাণুতে আক্রান্ত হবার ভয় থাকে।

ঋতু পরিবর্তনে সবার ত্বকই শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যায় আর বিভিন্ন চর্ম রোগ আক্রমণ করে। এখন চাই ত্বকের পর্যাপ্ত ময়েশ্চারাইজার। আপনার বাচ্চা স্কুলে অন্যদের মাধ্যমে কিছু ছোঁয়াচে চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে। শিশুর ত্বকের যত্ন নিতে বিশেষ খেয়াল রাখুন। নিয়মিত লোশন লাগান যেন ত্বক শুষ্ক হয়ে না যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যেন মেঝেতে খালি পায়ে না হাঁটে। অথবা মেঝেতে মাদুর বা মোটা কাপড় বিছিয়ে দিতে পারেন।

আপনার শিশুকে মৌসুমী বেশি বেশি ফলমূল, শাকসবজি ও সুষম খাদ্য নিশ্চিত করুন। এছাড়া দৈনিক এক চামচ মধু খাওয়ান তাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে ও সর্দি-কাশি কিংবা ঠান্ডা লাগার ঝামেলা একদম কমে যাবে। এছাড়া এ মৌসুমে ফ্রিজের ঠান্ডা পানি, আইসক্রিম খাওয়া বা রাতের বেলায় জোরে ফ্যান ছেড়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার কারণে টনসিল বা গলায় ব্যথা হয়। তাই এই সকল কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শিশুর শরীরে হালকা গরম পানি ব্যবহার করতে হবে। বেবি শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে সপ্তাহে দুই-এক দিন। শ্যাম্পু করার সময় শিশুর মাথা আলতোভাবে ম্যাসাজ করতে হবে। জোরে ম্যাসাজ করলে শিশুর মাথার ফলিকল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ■

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

জুনিয়র নোবেল জিতলেন জারিন

'জুনিয়র নোবেল প্রাইস' হিসেবে খ্যাত আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনভিত্তিক গ্লোবাল আন্ডারগ্র্যাজুয়েট অ্যাওয়ার্ডস জিতেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী জারীন তাসনিম শরীফ। 'ওয়েস্ট ইন দ্য সিটি: অ্যাগ্লোমেরেটিং লোকাল ইকোনমি অব মাতুয়াইল ল্যান্ডফিল' শিরোনামে স্নাতক থিসিসের জন্য তিনি এ পুরস্কার পান। জারীন এ পুরস্কার পাওয়া প্রথম বাংলাদেশি।

গ্লোবাল আন্ডারগ্রাজুয়েট অ্যাওয়ার্ডস বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ একাডেমিক পুরস্কারগুলোর মধ্যে একটি। এটি জুনিয়র নোবেল প্রাইস হিসেবে খ্যাত। আর জারিন এ পুরস্কার পাওয়া প্রথম বাংলাদেশি।

স্থাপত্য, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশলসহ মোট ২৫টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দিয়ে আসছে আন্ডরগ্রাজুয়েট অ্যাওয়ার্ডস কর্তৃপক্ষ। শিক্ষার্থীদের জমাকৃত থিসিস আবেদনপুলো থেকে প্রতি ক্যাটাগরিতে হাইলি কমেন্ডড এনট্রান্স, রিজিওনলি উইনার ও গ্লোবাল উইনার এই তিন পর্যায়ে পুরস্কার দেওয়া হয়।

এ বছর বিশ্বের ৭৩টি দেশ থেকে দুই হাজার ৮১২ টি থিসিস জমা পড়েছিল পুরস্কারের জন্য। এর মধ্যে আর্কিটেকচার ও ডিজাইন বিভাগে সেরা হয়েছেন জারিন তাসনিম।

পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণপদকের পাশাপাশি আয়োজকদের খরচে আগামী ৬-৯ নভেম্বর ডাবলিনে অনুষ্ঠেয় দ্য গ্লোবাল আন্ডারগ্র্যাজুয়েট সামিটে অংশ নেবেন জারিন। এছাড়াও দ্য গ্লোবাল আন্ডারগ্রাজুয়েট কর্তৃপক্ষের ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হবে তার থিসিসটি।

থিসিসটি মূলত মাতুয়াইলের ল্যান্ডফিল নিয়ে করা। কাজ করতে গিয়ে জারিন জানতে পারেন, ঢাকা প্রায় তিন দশক ধরে তার বর্জ্য মাতুয়াইলে ডাম্প করছে। ।

জারিন মনে করেন, দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ল্যান্ডফিলের বর্জ্যকে রিসাইকেল করার একটি সিস্টেম যদি দাঁড় করানো যায়, তাহলে পরিবেশ রক্ষা পাবে। এখানকার কৃষি ঐতিহ্যও ফিরে আসবে। থিসিসে এই সিস্টেমটাই ডিজাইন করেছেন জারিন, চেষ্টা করেছেন বর্জ্য নিয়ে মানুষের ধ্যানধারণা পালটাতে। বর্জ্যকে শুধু ফেলনা হিসেবে না দেখে বরং বর্জ্য থেকে কীভাবে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কমিউনিটি তৈরি করা যায় তা দেখিয়েছেন তিনি থিসিসে।

জারিন তাসনিম মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল থেকে এসএসসি এবং হলিক্রস কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। এরপর বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি হন তিনি। ■

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

রোবট পদ্মা সেতু

গরগর করে দিব্যি কথা বলতে পারে বাংলায়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম থেকে শুরু করে স্মরণীয় কিংবা বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম অনায়াসেই বলতে পারে। কার কথা বলছি বন্ধুরা বলো তো? বলছি একটি রোবটের কথা। এ রোবটটি তৈরি করেছেন আমাদের এক বন্ধু। তার নাম সাব্বির আহমেদ মামুন, বয়স ২০। তিনি নোয়াখালির কবিরহাট এলাকার ছেলে। তার আবিষ্কৃত রোবটটির নাম পদ্মা সেতু। টিফিন খরচ বাঁচিয়েও টিউশনি করে টাকা জোগাড় করে পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে তৈরি করেছে সে রোবটটি। তার তৈরি রোবটটি কথা বলতে পারে, কুশল বিনিময় করতে পারে। ব্যবহার করা যাবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও। মামুন ছোটোবেলা থেকেই বিজ্ঞানমনস্ক। তিনি ৬ মাসের মধ্যেই তৈরি করে ফেলেন রোবটটি। এর আগেও তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় অংশ নিয়ে তৈরি করেছেন স্মার্ট সড়ক, অন্ধের বন্ধু, নিরাপদ জানালাসহ অনেক গেজেট। এখন অনেক উন্নত দেশে রোবটকে মানুষের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মামুনের এমন একটি কথা বলতে পারা ও কাজ করতে পারা রোবট আবিষ্কার করতে পারায় অনেক গর্বিত স্থানীয়, দেশবাসী ও স্বজনেরা।

শিক্ষার্থীর উন্নত ড্রোন আবিষ্কার

কুমিল্লার বন্ধু ও মেধাবী শিক্ষার্থী মীর শাহরিয়ার আলম। শাহরিয়ারের স্বপ্ন বাংলাদেশ ড্রোন আমদানি নয় রপ্তানি করবে। উন্নত রোবট তৈরি করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে। এই স্বপ্ন নিয়েই সে তৈরি করে ফেলেছে পাঁচটি উন্নত প্রযুক্তির ড্রোন। বর্তমানে তিনি উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কাজে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন তার ইচ্ছা হয় একদিন নিজের তৈরি ড্রোন উড়াবেন। এরপর ২০১৯-২০২২ সালের মধ্যে তৈরিও করে ফেলেন ৫টি ড্রোন। এগুলোর এয়ারফ্রেম তৈরি হয়েছে নিজস্ব প্রযুক্তির কর্কশিট, অ্যালুমিনিয়াম পাইপ ও বাঁশের কঞ্চি দিয়ে। সেন্সর হিসেবে এক্সিলেরোমিটার, গাইরোস্কোপ ব্যারোমিটার ও জিপিএস সিস্টেম ব্যবহৃত হয়েছে। আর হার্ডওয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন নিজের তৈরি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সফটওয়্যার। এ ড্রোনগুলো দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, বন্যাকবলিত বা দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ওষুধ ও ত্রাণ সরবরাহ, ভালো রেজুলেশনের ছবি, ভিডিও সংগ্রহ ও সরাসরি কোনো বিষয় সম্প্রচার করা সম্ভব। শাহরিয়ার পঁচিশ থেকে সত্তর হাজার টাকা খরচ করে ড্রোনগুলো তৈরি করেছেন।

৪ মিনিটে রেকর্ড

নাম হাসান দাভির, বয়স মাত্র ১৬ বছর। বন্ধুটির বাড়ি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ লেবাননের রাজধানী বৈরুতে। প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী এই কিশোর। বিশ্বের সকল দেশের জাতীয় পতাকা চেনার বিশেষ দক্ষতা রয়েছে তার। দ্রুততম সময়ে সব দেশের পতাকা চেনার বিশ্বরেকর্ড করেছে সে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (ইউপিআই) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, লেবাননের কিশোর হাসান মাত্র ৪ মিনিটে সব দেশের জাতীয় পতাকা শনাক্ত করেছে। এর মধ্য দিয়ে সবচেয়ে কম সময়ে সব দেশের জাতীয় পতাকা চেনার বিশ্বরেকর্ড করে সে। আর ভেঙে ফেলেছে ২০২১ সালে করা অন্য বন্ধুর রেকর্ডটিও।

হাঁসের চাকরি

বন্ধুরা, এতদিন তো শুধু মানুষের কর্মব্যস্ততা বা চাকরির কথাই শুনেছ। আজ বলব হাঁসেদের চাকরির কথা। হ্যাঁ সত্যি বন্ধুরা, ঠিক শুনেছ। দশটা-পাঁচটা অফিস করছে হাঁসেরাও। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের বাইরে এরস্টে নদী তীরবর্তী অঞ্চলের ভাইনইয়ার্ডগুলোর প্রতিদিনের দৃশ্য এটি। সকাল হলেই হাজার হাজার হাঁস কাজে যায়। বিশ্বের ওয়াইন উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ আফ্রিকায় ২ লাখ ৭০ হাজারেরও বেশি মানুষের সাথে কাজ করে এই হাঁসেরাও। ভাইনইয়ার্ডে কোনো ধরনের রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। সেখানকার কৃষকরা সকাল হলেই নামিয়ে দেয় ইন্ডিয়ান রানার ডাক প্রজাতির হাঁসের ব্যাটালিয়ন। মাটি থেকে খুঁজে খুঁজে এরা কীটপতঙ্গ, কৃমি খেয়ে রক্ষা করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। আর তাদের মলমূত্র কাজ করে প্রাকৃতিক সার হিসেবে। আর এ চাকরির জন্য হাঁসেরা পায় বেতন ও বোনাস! প্রতিদিন রাতে তাদের জন্য বরাদ্দ বিভিন্ন প্রোটিনযুক্ত খাবার হলো তাদের বেতন। বছরে একবার ফসল কাটার মৌসুমে মাসখানেকের লম্বা ছুটি পায়। তার সাথে ভাইনইয়ার্ডের সেরা আঙুরের তাদের জন্য বরাদ্দকৃত একাংশ হলো বোনাস। দক্ষিণ আফ্রিকার এই অদ্ভুত পদ্ধতি প্রায় ৩০০০ বছর ধরে চলে আসছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

ছোটোদের আঁকা

ইনায়া, প্রথম শ্রেণি, এ জি ক্রুস স্কুল, ঢাকা

মো. আবু সাঈদ, দশম শ্রেণি, প্রগতি স্কুল উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর-১১, ঢাকা

ছোটোদের আঁকা

রুমাইজা শায়ওয়াত
চতুর্থ শ্রেণি
শহীদ বীর উত্তম
লে. আনোয়ার গার্লস স্কুল ও কলেজ

রুকাইয়া মারজুকা, দ্বিতীয় শ্রেণি, প্রতিভা প্রি-ক্যাডেট স্কুল, দৌলতপুর, খুলনা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

অ্যাডহক প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-47, No-05, November 2022, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

হেমন্তের সোনার ক্ষেতে, কৃষকেরা উঠছে মেতে

ফটোফিচার : মো. নাজিম উদ্দিন

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা